ভগবান মহাবীর ও জৈনধর্ম

শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা

भगवान महावीर और जैन
धर्म

ভগবান মহাবীর ও জৈনধর্ম

শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা

জৈন ভবন । কলিকাতা

ভগবান মহাবীরের ২৫০০ তম নির্বাণ
মহোৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত

শ্রীবিনোদ বৈদ-এর সৌজন্যে

প্রথম প্রকাশ ঃ কার্তিক ১৩৮১

দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ বৈশাখ ১৪০২

দাম ঃ পনের টাকা

শ্রীবিভাস দত্ত কর্তৃক অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৮১ সিমলা স্ট্রীট্, কলিকাতা-৭০০ ০০৬ হইতে মুদ্রিত ও জৈনভবনের মন্ত্রী শ্রীভাগচন্দ সুরানা কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট্, কলিকাতা-৭০০ ০০৭ হইতে প্রকাশিত।

পরলোকগত পূরণচাঁদ শ্যামসুখা মহাশয় জৈনধর্ম সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি উপাদেয় সদ্‌গ্রন্থ লিখিয়া, বাঙ্গালা ভাষার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত জৈনধর্ম সম্বন্ধে একখানি তথ্যপূর্ণ সুলিখিত পুস্তক পাঠ করিয়া, জৈনধর্ম সম্বন্ধে, কলেজে অধ্যয়নকালে আমার যে ধারণা ছিল তাহার পরিবর্তন করিতে হয় ও জৈনধর্মের গভীরতা, মহত্ত্ব এবং ঐতিহাসিক গৌরব সম্বন্ধে আমি কিছু পরিমাণে জানিতে সমর্থ হই। ভারতের চিন্তা ও ধর্মজগতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা ভগবান্ মহাবীর সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শ্যামসুখাজীর বইখানিও আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এই দুই বই, অপ্রাপ্য না হইলেও, দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি মহাবীর স্বামীর নির্বাণের পঞ্চশতাধিক-দ্বিসহস্র উৎসব উপলক্ষ্যে, এই দুইখানি সুন্দর পুস্তকের পুনঃ প্রচার কল্পে, শ্যামসুখাজীর সুপুত্রগণ এগুলির নূতন সংস্করণ একত্র একখণ্ডে প্রকাশিত করিতেছেন। ইঁহাদের এই প্রশংসনীয় প্রয়াস বিশেষভাবে সময়োপযোগী হইয়াছে। আশা করি, লোকনেতা ভগবান্ মহাবীর স্বামীর জীবনাবদান এবং তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ ও বিচারধারা জগতে মানবের মধ্যে শান্তি ও কল্যাণ আনয়নে সহায়তা করিবে, এবং এইরূপে শ্যামসুখা পরিবারের শুভ প্রয়াস যথাসম্ভব সার্থক হইবে। ইতি ইংরেজী ২২ নভেম্বর ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দ।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা

জৈন ধর্ম অতি প্রাচীন ধর্ম। জিন শব্দের অর্থ যিনি জয়লাভ করিয়াছেন। যিনি রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি অন্তঃশত্রুকে জয় করিয়াছেন তিনি **জিন**। জিনের প্রবর্তিত ধর্মের নাম জৈন ধর্ম। পূর্বে এই ধর্মকে আর্হৎ বা নির্গ্রন্থ ধর্ম নামে অভিহিত করা হইত।

জিনকে অর্হৎ, অর্হন্ত, অরিহন্ত, তীর্থঙ্কর প্রভৃতি অনেক নামে অভিহিত করা হয়। তীর্থঙ্কর শব্দের একটি বিশেষ অর্থ আছে। সাধু, সাধ্বী, শ্রাবক ও শ্রাবিকা-রূপ চতুর্বিধ সংঘকে তীর্থ বলা হয়। যিনি এইরূপ চতুর্বিধ সংঘ স্থাপন করিয়া নিয়মাবন্ধ করেন তাঁহাকেই **তীর্থঙ্কর** বলে।

জৈন শাস্ত্রে কালকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছেঃ অবসর্পিণী ও উৎসর্পিণী। অন্যান্য শাস্ত্রে যেমন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি নামক চারি যুগ ধরা হয় সেইরূপ জৈন শাস্ত্রে প্রত্যেক অবসর্পিণী ও উৎসর্পিণীকে ছয়টি ভাগে অর্থাৎ যুগে বিভক্ত করা হয়। এইরূপ প্রতি বিভাগকে এক একটি **অর** কহে—সময়রূপ চক্রের যেন এক একটি অর অর্থাৎ পাখি। যে সময়ে আয়ু, বল, সুখ, শরীরের পরিমাণ আদি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে তাহাকে **অবসর্পিণী** বলে। আর যে সময়ে আয়ু, বল প্রভৃতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে তাহাকে **উৎসর্পিণী** বলে। অবসর্পিণীর-পর উৎসর্পিণী এবং উৎসর্পিণীর পরে অবসর্পিণী এই ভাবে অনাদি কাল হইতে কালচক্র চলিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক অবসর্পিণী ও উৎসর্পিণীর তৃতীয়

এবং চতুর্থ বিভাগে চব্বিশ জন করিয়া তীর্থঙ্কর আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

বর্তমানে অবসর্পিণী কালের পঞ্চম অর অর্থাৎ বিভাগ চলিতেছে। বর্তমান অবসর্পিণীর তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগে চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন। চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে শ্রীঋষভ দেব প্রথম ও শ্রীমহাবীর শেষ তীর্থঙ্কর। শ্রীঋষভ দেবই এই অবসর্পিণীতে সর্বপ্রথম ধর্ম প্রচার করেন। ইনিই সর্ব-প্রথম রাজা—অর্থাৎ ইঁহার পূর্বে বর্তমান অবসর্পিণীতে আর কোনও ব্যক্তি রাজপদে অভিষিক্ত হন নাই। ভগবান্ ঋষভ দেবই রাজ্যাবস্থায় থাকাকালে মনুষ্যগণকে সর্বপ্রথম সাংসারিক কৃত্য সমূহ শিক্ষা দেন। এমন কি মাটীর বাসন তৈয়ার করা, ধান্য হইতে চাউল বাহির করা, চাউল সিদ্ধ করা প্রভৃতি সাংসারিক কার্য সমূহ তিনিই শিখাইয়াছেন। বহু বৎসর রাজ্য ভোগের পর তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন এবং প্রথম ধর্ম প্রচার করেন। এজন্য তাঁহাকে আদিদেব বা আদিনাথ নামে অভিহিত করা হয়। জৈন ধর্মে তীর্থঙ্করগণই দেবপদ বাচ্য। সমস্ত তীর্থঙ্করগণই উচ্চ ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেকেই সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী।

বর্তমান অবসর্পিণীতে যে চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর হইয়াছেন তাঁহাদের নাম, জন্মস্থান ও নির্বাণ স্থানের উল্লেখ করা যাইতেছেঃ

নাম	জন্মস্থান	নির্বাণস্থান
১। ঋষভ দেব	বিনীতা (অযোধ্যা)	অষ্টাপদ (কৈলাস পর্বত)

২। অজিতনাথ	অযোধ্যা	পার্শ্বনাথ পর্বত
৩। সম্ভবনাথ	শ্রাবস্তী[১]	” ”
৪। অভিনন্দন	অযোধ্যা	” ”
৫। সুমতিনাথ	”	” ”
৬। পদ্মপ্রভ	কৌশাম্বী[২]	” ”
৭। সুপার্শ্বনাথ	কাশী	” ”
৮। চন্দ্রপ্রভ	চন্দ্রপুরী[৩]	” ”
৯। সুবিধিনাথ	কাকন্দী[৪]	” ”
১০। শীতলনাথ	ভদ্দিলপুর[৫]	” ”
১১। শ্রেয়াংসনাথ	সিংহপুর[৬]	” ”
১২। বাসুপূজ্য	চম্পাপুরী[৭]	চম্পাপুরী
১৩। বিমলনাথ	কম্পিলপুর[৮]	পার্শ্বনাথ পর্বত
১৪। অনন্তনাথ	অযোধ্যা	” ”
১৫। ধর্মনাথ	রত্নপুর	” ”
১৬। শান্তিনাথ	হস্তিনাপুর	” ”
১৭। কুন্থুনাথ	”	” ”
১৮। অরনাথ	”	” ”
১৯। মল্লিনাথ	মিথিলা	” ”

১। গোণ্ডা জেলার অন্তর্গত বর্তমান 'সাহেৎ মাহেৎ' গ্রাম।
২। এলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত বর্তমান 'কোসমই' গ্রাম।
৩। কাশী হইতে প্রায় ২০ মাইল দূরে বর্তমান চন্দ্রাবতী গ্রাম। এখানে জৈন মন্দির আছে।
৪। বিহার প্রদেশের অন্তর্গত লক্ষ্মীসরাই ষ্টেশন হইতে ১৪ মাইল দূরে কাকন্দী গ্রাম। জৈন মন্দির আছে।
৫। গয়া জেলায় দন্তারা গ্রামের নিকট ভগ্নাবশেষ।
৬। বর্তমান সারনাথের নিকট। জৈন মন্দির আছে।
৭। বর্তমান ভাগলপুর নগরের নিকট। জৈন মন্দির আছে।
৮। বর্তমান ফরাক্কাবাদ হইতে ২৫ মাইল উত্তর পশ্চিম।

২০। মুনিসুব্রত	রাজগৃহ	পার্শ্বনাথ পর্বত
২১। নমিনাথ	মিথিলা	,, ,,
২২। নেমিনাথ বা অরিষ্ট নেমি	শৌরিপুর[৯]	গির্নার পর্বত
২৩। পার্শ্বনাথ	বারাণসী	পার্শ্বনাথ পর্বত
২৪। মহাবীর বা বর্ধমান	ক্ষত্রিয় কুণ্ডগ্রাম[১০]	পাবাপুরী[১১]

৯। আগ্রা হইতে উত্তর পশ্চিমে বর্তমান বটেশ্বর গ্রাম। জৈন মন্দির আছে।

১০। মজঃফরপুর জেলায় বেসাঢ় গ্রামের নিকট বসুকুণ্ড গ্রাম। হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে। জৈন মন্দির আছে।

১১। পাটনা জেলায় বিহার শরীফ ষ্টেশন হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে। জৈন মন্দির আছে।

ভগবান্ মহাবীর

যে সময়ে ভগবান্ মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন তখন ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ উত্তর ভারতের, রাষ্ট্রগত, অর্থগত, সমাজগত ও ধর্মগত অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা ক্রমান্বয়ে সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে।

রাষ্ট্রগত অবস্থা

সে সময়ে ভারতবর্ষ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সম্পূর্ণ ভারত বা ভারতের অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়া কোন বৃহৎ সাম্রাজ্য সে সময়ে ছিল না। মহাভারতের মহা নরঘাতী সংগ্রামে ক্ষাত্র-শক্তি নির্মূলপ্রায় হইয়া গিয়াছিল; তাহা তখন পর্যন্তও এমন শক্তি উপার্জন করিতে পারে নাই যাহাতে কোন এক বীর বা বীরবংশ প্রভাব বিস্তার করিয়া বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সক্ষম হয়। ইহার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতিগণ কারণে অকারণে পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন, তাহাতেও ক্ষাত্র শক্তির যথেষ্ট অপচয় ঘটিত এবং কোন এক নৃপতিও যথেষ্ট শক্তি সংগ্রহের অবকাশ লাভ করিতেন না। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তাহা খৃষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দীর শেষভাগ ও ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল। উত্তর ভারতে তখন মগধ, অঙ্গ, বিদেহ, বজ্জী, কাশী, কোশল, মল্ল, বৎস, পাঞ্চাল, কুরু, মৎস্য, অবন্তী, সিন্ধু-সৌবীর, গান্ধার প্রভৃতি রাজ্য ছিল। জৈন শাস্ত্রে সার্ধ-পঞ্চবিংশতি দেশের নাম পাওয়া যায়, যে সকল দেশকে আর্যদেশ বলা হইত। এই সমস্ত রাজ্যের মধ্যে এমন কোনও রাজ্য ছিল না, যাহা অন্য

সকলের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে। মগধরাজ্য তখন কিছু বল সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহাও এত পরাক্রান্ত হইতে পারে নাই যাহাতে রাজ্যের সীমা সবিশেষরূপে বিস্তার করিতে পারে। মগধের সহিত বৈশালীর যুদ্ধে বৈশালীর লিচ্ছবীরা পরাস্ত ও বৈশালী নগরী বিধ্বস্ত হইলেও মগধ বিদেহরাজ্যকে স্বরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে সক্ষম হয় নাই।

এই সমস্ত রাজ্যের মধ্যে অধিকাংশই ছিল রাজতন্ত্র। গণতন্ত্রের অস্তিত্বও তখন ছিল। যে সকল বংশ একক নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার উপযুক্ত শক্তিশালী ছিল না তাহারা কয়েক বংশ মিলিত হইয়া এক একটি রাজ্য স্থাপন করিত। প্রথমতঃ প্রত্যেক বংশ বা উপজাতি নিজেদের মধ্যে একজনকে দলপতি নির্বাচন করিত। এরূপ দলপতিকে গণরাজ বা রাজা বলিয়া অভিহিত করা হইত। এই রাজগণ সেই সেই বংশ বা উপজাতিগণের মধ্যে রাজার ন্যায় ক্ষমতা পরিচালিত করিতেন। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলপতিগণ সম্মিলিত হইয়া এক একটি বৃহত্তর রাজ্য স্থাপন করিতেন এবং আপনাদের মধ্য হইতে একজনকে উহার অধিনায়ক মনোনীত করিতেন। যুদ্ধ বিগ্রহ, দেশ-রক্ষাপ্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সমস্ত উপজাতিগণের রাজগণ একত্র হইয়া পরামর্শ ও কর্তব্য নির্ধারণ করিতেন। বৈশালী এইরূপ একটি সম্মিলিত গণরাজ্যের রাজধানী ছিল। বজ্জী, লিচ্ছবী ও মল্লগণ এবং তাহাদের বহু উপ-জাতিগণ একত্র হইয়া এই গণরাজ্য স্থাপন করেন। মল্ল-গণের নয়টি ও লিচ্ছবীগণের নয়টি উপজাতি সমূহের উল্লেখ জৈনশাস্ত্রে পাওয়া যায়। মহারাজ চেটক এই সম্মিলিত গণতন্ত্রের মুখ্যাধিনায়ক ছিলেন। বৈশালী

ব্যতীত আরও কয়েকটি গণতন্ত্র রাজ্যের কথা জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া যায়।

অর্থগত অবস্থা

বাণিজ্য বিষয়ে ভারত সে সময়ে খুবই অগ্রসর ছিল। বড় বড় নদীর তীরবর্তী নগর ও বন্দর সমূহ হইতে সার্থ-বাহগণ বৃহৎ বৃহৎ সমুদ্রগামী জলযানে নানা দেশ-বিদেশে বাণিজ্য করিতে গমন করিতেন। এরূপ সমুদ্র-বাণিজ্যের উল্লেখ জৈন সাহিত্যে সুপ্রচুর পাওয়া যায়। বণিকবৃন্দ স্বদেশ হইতে নানা প্রকার পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ পূর্বক বৃহৎ বৃহৎ জলযানে পূর্ণ করিয়া বহু লোকজন ও রক্ষিগণ সহ সমুদ্র যাত্রায় বহির্গত হইতেন। যে দেশে গমন করিতেন সেখানে নিজের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করতঃ তথাকার বিশেষ পণ্যদ্রব্যগুলি ক্রয় করিয়া পুনরায় নৌবহর পূর্ণ করিতেন এবং অন্যদেশে গিয়া সেই সমস্ত বিক্রয় করিতেন ও তথাকার দ্রব্য ক্রয় করিতেন। এইরূপে তাঁহারা প্রভূত ধন উপার্জন করিতেন। জৈন শাস্ত্রে এরূপ বণিকের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যাঁহার চারি কোটি স্বর্ণমুদ্রা ভূমিতে প্রোথিত ছিল, চারি কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিল এবং চারি কোটি স্বর্ণমুদ্রা পরিমিত সম্পত্তি ছিল এবং চারিটি গোব্রজ ছিল যাহার প্রত্যেক ব্রজে দশ সহস্র করিয়া গবাদি পশু থাকিত। এইরূপ আরও বহু ধন-সম্পত্তির তিনি অধিকারী ছিলেন। এই সমস্ত ধনী বণিক্‌গণ বহুতল-বিশিষ্ট উচ্চ মনোরম হর্ম্যে বহু দাস-দাসী সমভিব্যাহারে বাস করিতেন। তাঁহারা প্রায়ই ৪ জন, ৮ জন, ১৬ জন, এমন কি ৩২ জন পত্নী গ্রহণ করিতেন। এই সকল ধনীবর্গের কেহ কেহ এবং তাঁহাদের পুত্রগণ

এত বিলাস ব্যসনে মগ্ন থাকিতেন যে কখন সূর্য উদিত ও অস্তমিত হয় তাহাও বুঝিতে পারিতেন না।

বহির্বাণিজ্য যেরূপ বিস্তৃত ছিল, অন্তর্বাণিজ্যও তাহা অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিল না। শত শত শকট পরিপূর্ণ পণ্যদ্রব্য লইয়া সার্থবাহগণ রক্ষিগণ সহ একদেশ হইতে অন্যদেশে ব্যবসায় করিয়া বেড়াইতেন। এইরূপে নদীর তীরবর্তী দেশ সমূহের মধ্যে নৌকার সাহায্যে ব্যবসায় পরিচালিত হইত। এই সমস্ত বাণিজ্যের দ্বারা বণিক্‌গণ অগণিত অর্থ উপার্জন করিতেন। কিন্তু দেশে উচ্চ শ্রেণীর জনগণের আর্থিক অবস্থা যেরূপ উন্নত ছিল নিম্ন-শ্রেণীস্থের অবস্থা ছিল তদ্রূপ হীন।

সমাজগত অবস্থা

ব্রাহ্মণগণের দ্বারা প্রবর্তিত সমাজ-ব্যবস্থাই সর্বত্র প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণগণ সর্বোচ্চে ছিলেন, সমাজে তাঁহারাই আধিপত্য করিতেন। ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতেন, বৈশ্যগণের হস্তে সমস্ত বাণিজ্য ও অর্থ ব্যবস্থা ছিল। শূদ্রাদি সমাজের নিম্নস্তরের ব্যক্তিগণ দাসত্ব কার্যে নিয়োজিত, নির্ধন ও উপেক্ষিত ছিল। জাতি জন্মগত হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ মাত্র বাহ্য আকার সম্পন্ন, অহঙ্কারী ও আড়ম্বর-প্রিয় হইয়া গিয়াছিলেন, তজ্জন্য জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যে ব্রাহ্মণ শব্দের নূতন ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল। বৈশ্যগণ প্রচুর ধন সম্পত্তি উপার্জন করিয়া বিলাস ব্যসনে মগ্ন থাকিতেন। স্ত্রীলোকের অবস্থা যে ভাল ছিল তাহা বলা যায় না। নানা প্রকার সম্পত্তির ন্যায় স্ত্রীগণও গার্হস্থ্য সম্পত্তি স্বরূপ বিবেচিত হইত। রাজগণ ও ধনী সম্প্রদায় বহু নারীকে বিবাহ করিতেন। যুদ্ধ বিগ্রহের সময় সম্পত্তি লুণ্ঠনের ন্যায় স্ত্রীগণকেও লুণ্ঠন

করা হইত, তাহাদের কতককে লুণ্ঠনকারিগণ নিজের উপ-ভোগের সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত করিত আর কতককে প্রকাশ্য হাটে বিক্রয় করিত। যুদ্ধে বহু পুরুষের নিধন হইত বলিয়া পুরুষের সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় হয়ত বহু বিবাহ প্রথার কতক প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল ও কতক অত্যধিক বিলাস ব্যসনের জন্যও হইয়াছিল। উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রীগণের মধ্যে শিক্ষার কিছু প্রচলন ছিল কিন্তু সাধারণ স্তরের স্ত্রীগণের মধ্যে শিক্ষার অভাবই ছিল। উচ্চ তিনটি শ্রেণীর পুরুষগণের মধ্যে শিক্ষার উত্তম প্রচলন ছিল—বৈশ্যগণ কতকাংশে যুদ্ধ বিদ্যাও শিক্ষা করিতেন।

ধর্মগত অবস্থা

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিশেষ প্রচলন ছিল। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড অত্যন্ত প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ধনী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ সাড়ম্বরে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন এবং এই সমস্ত যজ্ঞে শত শত নিরীহ পশু নিহত হইত। উপনিষদের ব্রহ্মবাদ প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। শ্রমণ তপস্বিগণেরও অস্তিত্ব ছিল এবং তাঁহাদের সংখ্যা বিস্তৃত হইতেছিল। তাঁহারা যজ্ঞাদিতে পশুবধের নিন্দা করিতেন ও অহিংসা ধর্মের প্রচার করিতেন। ভগবান্ পার্শ্বনাথ প্রবর্তিত নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ের সাধু ও গৃহস্থগণের অস্তিত্বের বিবরণ জৈন সাহিত্যে অনেক প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাবীরের নির্বাণের ২৫০ বৎসর পূর্বে পার্শ্বনাথের নির্বাণ লাভ হইয়াছিল অতএব মহাবীরের জন্ম সময়ে বা তাহার কিছু পূর্বে পার্শ্বনাথের শ্রমণ সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহ, ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যধিক ধনসম্পত্তি একত্রিত হওয়া, নিম্নস্তরের ব্যক্তিগণের প্রতি

ব্রাহ্মণগণের ঘৃণা ও সামাজিক অত্যাচারের জন্য তাহাদের শোচনীয় দুর্দশা প্রভৃতি কারণে সমাজে যে একটা প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল তাহা অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবে না। এই প্রতিক্রিয়ার জন্য এ সময়ে আমরা অনেক কয়টি ধর্ম-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব দেখিতে পাই। বৌদ্ধশাস্ত্রে ছয়-জন তীর্থঙ্কর[১২] [সঞ্জয় বেলট্ঠীপুত্ত, পকুধ কাচ্চায়ন, অজিত কেশকম্বলী, মঙ্খলীপুত্ত-গোশালক, পূরণ কাশ্যপ ও নিগণ্ঠ নাতপুত্ত (মহাবীর)] এবং ৬৩ প্রকার ধর্ম সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। জৈন শাস্ত্রে ক্রিয়াবাদী,[১৩] অক্রিয়াবাদী, অজ্ঞান-বাদী ও বিনয়বাদী এই চারিটি প্রধান বিভাগ ও তাহাদের ৩৬৩টি উপবিভাগ করিয়া ধর্ম সম্প্রদায়ের গণনা করা হইয়াছে। এই সমস্ত ধর্মপ্রচারকগণ যজ্ঞে পশুবলির নিন্দা করিতেন, অন্ত্যজ জাতির ব্যক্তি-গণকেও স্বসম্প্রদায়ে গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহাদের যোগ্যতা থাকিলে তাঁহাদিগকে উচ্চ সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে অত্যধিক বিলাস প্রবণতা ও সমাজের নিম্নস্তরের ব্যক্তিগণের প্রতি অনুষ্ঠিত অত্যাচারের একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া এবং তীব্র ধর্ম-জিজ্ঞাসার ভাবের সে সময়ে উদ্ভব হইয়াছিল। এই সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায় বৈদিক যজ্ঞাদির বিরোধী ছিল এবং ত্যাগ, সংযম ও তপস্যাচরণকে শ্রেয়স্কর মনে করিত। কোন কোন সম্প্রদায় ঘোর তপস্যা করিত। আজীবকগণ নগ্ন থাকিত ও কঠোর তপস্যায় লিপ্ত থাকিত। তখনকার সমাজ যেন যুদ্ধ বিগ্রহ, যজ্ঞাদি ক্রিয়া কাণ্ডের বাহুল্য ও বিলাস বৈভবের দ্বারা পীড়িত হইয়া শান্তি ও মুক্তি পাইবার

১২। সুত্তনিপাত—সভিয় সুত্ত।
১৩। সূত্রকৃতাঙ্গ—১।১২।১

জন্য একটা নবীন আদর্শের অপেক্ষা করিতেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে আমরা মহাবীরের ত্যাগ, সংযম ও তপস্যাময় জীবনের আদর্শ কতক অনুমান করিতে পারিব।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

বৈশালী গণতন্ত্রের রাজধানী বৈশালী নগরীর **ক্ষত্রিয় কুণ্ডগ্রাম** নামক একটি উপনগরে খৃঃ পূঃ ৫৯৯ অব্দে চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশীর রাত্রিতে উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রে ভগবান্ মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন। মহাবীরের পিতার নাম **সিদ্ধার্থ**। ইনি জ্ঞাত-বংশীয় ক্ষত্রিয়গণের রাজা বা নেতা ছিলেন। জ্ঞাত-বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ ক্ষত্রিয় কুণ্ডগ্রামের উত্তরার্ধে বাস করিতেন। জ্ঞাত শব্দ প্রাকৃত ভাষায় 'নায়' হয়, এইজন্য মহাবীরকে পুরাতন জৈন সাহিত্যে **নায়পুত্ত** বলা হইয়াছে। বৌদ্ধগ্রন্থে ইঁহাকে **নাতপুত্ত** নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

সিদ্ধার্থের স্ত্রী রাজ্ঞী **ত্রিশলা** মহাবীরের মাতা। ইনি বৈশালী গণতন্ত্রের মুখ্যাধিনায়ক হৈহয় বংশীয় মহারাজ চেটকের ভগ্নী। মহারাজ চেটকের সাতটি কন্যা ছিলেন, তন্মধ্যে একজন শ্রমণ-দীক্ষা গ্রহণ করেন ও ছয়জন সে সময়ের বিখ্যাত ছয়জন নৃপতির সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। যথাঃ—মগধের মহারাজ শ্রেণিক (বিম্বিসার), অঙ্গ-দেশের দধিবাহন, কৌশাম্বীর শতানীক, অবন্তীপতি প্রদ্যোত, সিন্ধু-সৌবীর দেশের রাজা রুদ্রায়ণ (বা উদায়ন) ও মহাবীরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা নন্দিবর্ধন। মাতুল-কন্যার সহিত বিবাহ তখন প্রচলিত ছিল। এই সমস্ত বৈবাহিক সম্বন্ধের দ্বারা, মহাবীরের পিতা সিদ্ধার্থের যে বংশ মর্যাদা অতি উচ্চ ছিল তাহা প্রকাশিত হয়।

ভগবান্ মহাবীর যে সময়ে মাতৃগর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখন তাঁহার মাতা চতুর্দশটি মহাস্বপ্ন দেখিয়া জাগরিত হন। যথাঃ—হস্তী, বলীবর্দ, সিংহ, লক্ষ্মীদেবীর অভিষেক, পুষ্পমালা, চন্দ্র, সূর্য, ধ্বজা, কুম্ভ, পদ্ম-সরোবর, সমুদ্র, দেব-বিমান, রত্নরাশি ও নির্ধূম অগ্নি। জৈনশাস্ত্রে লিখিত আছে যে মাতা এই চতুর্দশটি স্বপ্ন দর্শন করিলে গর্ভস্থ সন্তান চক্রবর্তী সম্রাট বা তীর্থঙ্কর হইবে ইহাই সূচিত হয়।

মহাবীর যখন গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিলেন তখন হইতে সিদ্ধার্থ রাজার ধন, ধান্য, সমৃদ্ধি ও রাজ্যাদির বৃদ্ধি হইতেছিল। এজন্য তিনি নবজাত শিশুর নাম **বর্ধমান** রাখিয়াছিলেন। সিদ্ধার্থের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম ছিল **নন্দিবর্ধন** ও কন্যার নাম **সুদর্শনা**।

কুমার বর্ধমান রাজপুত্রোচিত বৈভবের মধ্যে লালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যকালের যে সামান্য বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে তিনি অসাধারণ শক্তিশালী, নির্ভীক, তেজস্বী, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ও গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। তাঁহার নির্ভীকতার উদাহরণে উল্লিখিত আছে যে একদা নগর বহিঃস্থ উদ্যানে ক্রীড়া করিবার সময় সে স্থলে একটি বৃহৎ সর্প আসিয়া পড়ে। সর্প দেখিয়া অন্যান্য বালকগণ পলায়ন করে কিন্তু বর্ধমান ভীত না হইয়া সর্পকে ধরিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া খেলায় মনোনিবেশ করেন। যাহা হউক সময়োচিত সমস্ত সুব্যবস্থার মধ্যে তাঁহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়।

বয়স্থ হইলে কুমার বর্ধমানের সমরবীর নামক সামন্ত রাজার কন্যা **যশোদার** সহিত বিবাহ হয় ও এই বিবাহের ফল স্বরূপ তাঁহার **প্রিয়দর্শনা** বা **অনবদ্যা** নামে এক কন্যা

জন্মগ্রহণ করে। প্রিয়দর্শনার বিবাহ বর্ধমানের ভগ্নী সুদর্শনার পুত্র জমালির সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল।

কুমার বর্ধমানের বয়ঃক্রম যখন ২৮ বৎসর তখন তাঁহার মাতা ও পিতা উভয়েরই মৃত্যু হয়। তিনি তখনই গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু জ্যেষ্ঠভ্রাতা নন্দিবর্ধনের আগ্রহাতিশয্যে আরও দুই বৎসর গৃহে থাকিতে সম্মত হন। এই দুই বৎসর গৃহে বাস করিলেও তিনি কেশবিন্যাস, পুষ্পমালা ধারণাদি প্রসাধন এবং সমস্ত ভোগোপভোগের সামগ্রী বর্জন করিয়া সংযত জীবন যাপন করিতে থাকেন। শেষবর্ষে তিনি যাচকবর্গকে দান দিতে আরম্ভ করেন। এই দান এক বৎসর পর্যন্ত প্রত্যহ প্রাতঃকালে অনুষ্ঠিত হইত ও প্রত্যেক যাচক অভীপ্সিত ধনাদি প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিত।

অভিনিষ্ক্রমণ

এইরূপে দুই বৎসরকাল সংযত জীবন যাপন করিয়া ত্রিশ বৎসর বয়সে কুমার বর্ধমান শ্রমণদীক্ষা গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি ধন, সম্পত্তি, স্ত্রী, পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বস্ত্রাভরণ ও সর্বপ্রকার দৈহিক সুখ পরিত্যাগ করিয়া মার্গশীর্ষ মাসে কৃষ্ণা দশমী তিথিতে উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রে দিনমানের চতুর্থ প্রহরে ক্ষত্রিয় কুণ্ডপুরের বহির্ভাগে ঈশান কোণে অবস্থিত 'জ্ঞাতষণ্ড-বন' নামক উদ্যানে বহু আত্মীয় স্বজন ও পুরবাসিগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া গমন করিলেন। তথায় অশোকবৃক্ষের নীচে দেহের সমস্ত আভরণ ও বস্ত্র উন্মোচন করেন ও নিজহস্তে মস্তকের কেশ পাঁচবার মুষ্টি মুষ্টি করিয়া উৎপাটন পূর্বক একটি

মাত্র দিব্য বস্ত্র[১৪] স্কন্ধে ধারণ করতঃ একাকী অভিনিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অভিনিষ্ক্রমণের সময় তিনি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন—আমি আজ হইতে জীবন পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীর প্রতি সমভাব অবলম্বন করিব এবং মন, বচন ও কায়ার দ্বারা কোনও প্রকার পাপজনক আচরণ করিব না, অন্যের দ্বারা করাইব না ও অন্য কেহ তদ্রূপ আচরণ করিলে তাহা অনুমোদন করিব না, এ পর্যন্ত যে সমস্ত পাপজনক আচরণ করিয়াছি তাহার জন্য পশ্চাত্তাপ করিতেছি ও তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতেছি। তিনি স্বহস্তে দীক্ষা গ্রহণ করেন। জৈন তীর্থঙ্করগণের আচারই এইরূপ যে তাঁহারা স্বহস্তেই দীক্ষা গ্রহণ করেন—অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন না।

দীক্ষা গ্রহণের সময় তাঁহার দুই দিবসব্যাপী উপবাস ছিল। বর্ধমানের পিতামাতা ত্রয়োবিংশতিতম তীর্থঙ্কর ভগবান্ পার্শ্বনাথের প্রবর্তিত নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ের উপাসক ছিলেন। অতএব কুমার বর্ধমান যে নির্গ্রন্থ ধর্মের উপদেশাবলীর দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

লিখিত আছে যে জন্ম হইতেই তিনি **মতিজ্ঞান, শ্রুত-জ্ঞান** ও **অবধিজ্ঞান**[১৫] সম্পন্ন ছিলেন এবং দীক্ষাগ্রহণের পরই চতুর্থ **মনঃপর্যায়** জ্ঞান লাভ করেন। জ্ঞাতষণ্ড-বন হইতে প্রস্থান করিবার সময় এক ব্রাহ্মণ যাচক আসিয়া দান প্রার্থনা করিলে তিনি স্কন্ধস্থিত দিব্যবস্ত্রের অর্ধেক ছিঁড়িয়া তাহাকে দান করেন। অবশিষ্ট অর্ধবস্ত্র ১৩ মাস

১৪। জৈনশাস্ত্রে এই বস্ত্রকে দেবদূষ্য বলা হইয়াছে।
১৫। জৈন শাস্ত্রমতে জ্ঞান পাঁচ প্রকার—মতিজ্ঞান, শ্রুতজ্ঞান,

যাবৎ তাঁহার স্কন্ধে ছিল তৎপরে তিনি সম্পূর্ণ নির্বস্ত্র হইয়াছিলেন।

সাধক জীবন

এইবার বর্ধমানের সাধক জীবন আরম্ভ হইল। প্রথমেই তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে—এখন হইতে দ্বাদশ বৎসর যাবৎ শরীরের কোন প্রকার যত্ন লইবেন না, দেব, মনুষ্য বা পশ্বাদিকৃত যে কোনও প্রকার বিঘ্ন, কষ্ট বা যন্ত্রণা অবিচলিত চিত্তে সহ্য করিবেন এবং দুঃখ প্রদানকারীর প্রতি ক্ষমা ও সমভাব পোষণ করিবেন। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি তপ, সংযম, ব্রহ্মচর্য, ক্ষান্তি, ত্যাগ, সন্তোষ অবলম্বন ও মুক্তিমার্গের চিন্তা করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

জ্ঞাতষণ্ড-বন উদ্যান হইতে একাকী প্রস্থান করিয়া দিবসের মুহূর্তমাত্র অবশেষ থাকিতে তিনি কুম্মার গ্রামে আসিয়া রাত্রি যাপনের উদ্দেশ্যে ধ্যানস্থ হইলেন। দ্বিতীয় দিনে কোল্লাগ সন্নিবেশে (colony) গমন করিয়া বহুল নামক ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা করিয়া পারণ করেন।

অবধিজ্ঞান, মনঃপর্যায়জ্ঞান ও কেবলজ্ঞান। মন ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে জ্ঞান হয় তাহা মতিজ্ঞান, পুস্তকাদি পাঠে বা অন্যের উপদেশে যে জ্ঞান হয় তাহা শ্রুতজ্ঞান; ইন্দ্রিয় ও মনের সাহায্য ব্যতিরেকে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সমস্ত রূপযুক্ত পদার্থকে যে জ্ঞানের দ্বারা জানা যায় তাহা অবধিজ্ঞান; ইন্দ্রিয় ও মনের সহায়তা ব্যতীত প্রাণিগণের মনোভাবকে যে জ্ঞানের দ্বারা জানা যায় তাহা মনঃপর্যায় জ্ঞান এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান-কালের সমগ্র বিশ্বের সমস্ত পদার্থকে সম্পূর্ণরূপে যে জ্ঞানের দ্বারা জানা যায় তাহা কেবলজ্ঞান। শেষোক্ত তিনটি আত্মিক জ্ঞান।

কয়েকমাস নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বর্ষাকালের চতুর্মাস একস্থানে অবস্থান করিবার অভিপ্রায়ে মোরাক সন্নিবেশের বহিঃস্থ 'দুইজ্জন্ত' নামক আশ্রমে আগমন করেন। এই আশ্রমের কুলপতি রাজা সিদ্ধার্থের মিত্র ছিলেন। কয়েকদিবস আশ্রমে অতিবাহিত করার পর সেখানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশের অভাব দেখিয়া ও তাঁহার অবস্থান আশ্রমবাসিগণের প্রীতিকর হইবে না মনে করিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিয়া অস্থিকগ্রামে চতুর্মাস যাপন করেন।

এখন হইতে শ্রমণ বর্ধমান অধিকাংশ সময় মৌনাবলম্বন করিয়া ধ্যানস্থ থাকিতেন ও ঘোর তপস্যা করিতেন।

আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক যে কোন প্রকার দুঃখ, কষ্ট বা উৎপাত উপস্থিত হইত তাহা তিনি অবিচলিতভাবে সহ্য করিতেন। ঘৃণা, লজ্জা ও ভয়কে তিনি সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়াছিলেন। দেহাত্মবোধ তাঁহার সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছিল বলিয়া, যতই ভীষণ হউক না কেন কোনও প্রকার শারীরিক যন্ত্রণায় তিনি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইতেন না। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে বা তীব্র শীতে তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারিত না। গ্রীষ্মকালে প্রখর সূর্যতাপে তিনি শিলাখণ্ডের উপর দণ্ডায়মান হইয়া ধ্যান করিতে থাকিতেন বা উত্তপ্ত মাঠের মধ্য দিয়া চলিতে থাকিতেন। শীতকালে যখন প্রবলবেগে শীতল বাতাস প্রবাহিত হইত, যখন অন্যান্য সাধুগণ আশ্রয় ও বস্ত্র পাইবার জন্য বা অগ্নি সেবন করিতে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেন তখন তিনি সেই তীব্র শীতে উন্মুক্তস্থানে, নগ্নদেহে ধ্যান করিতে থাকিতেন, কোনও প্রকার আশ্রয়, বস্ত্রাচ্ছাদন বা অগ্নিসেবনের ইচ্ছা পর্যন্ত করিতেন না। উপকার অপকার, সুখ দুঃখ, জীবন মৃত্যু, আদর অপমান প্রভৃতিতে সম্পূর্ণ সমভাব অবলম্বন

পূর্বক কর্ম-রূপী শত্রুকে সমুচ্ছেদ করিয়া সংসার সমুদ্র পার হইবার নিরন্তর প্রযত্নে লগ্ন থাকিতেন। তিনি বর্ষাকালের চারিমাস একস্থানে অবস্থান করিতেন, অন্য সময়ে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, নগর হইতে নগরান্তরে পদব্রজে পরিভ্রমণে রত থাকিতেন। ভ্রমণ করিবার সময় ধীর পদবিক্ষেপে সম্মুখের পথের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বিচরণ করিতেন যাহাতে পদতলে আগত কোনরূপ প্রাণীর হিংসা না হয়।

যখন যেখানে গমন করিতেন সেখানে শূন্য ও পরিত্যক্ত গৃহে, শ্মশানে, উদ্যানে, বৃক্ষতলে বা অন্য কোন নির্জন স্থানে অবস্থান করিতেন।

তিনি অধিকাংশ দিনই উপবাসাদি তপস্যা ও ধ্যানে রত থাকিতেন। পারণের সময় ভিক্ষালব্ধ, নীরস, লঘু ও পরিমিত আহার গ্রহণ করিতেন। যে গৃহে ভিক্ষার্থ গমন করিতেন সেখানে যদি অন্য কোন ভিক্ষার্থী, পশু বা পক্ষী আহার্য পাইবার জন্য প্রথম হইতে অপেক্ষা করিতেছে দেখিতেন তবে তাহাদের আহার্য প্রাপ্তির পক্ষে অন্তরায় হইতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি তথা হইতে নিঃশব্দে প্রস্থান করিয়া অন্য গৃহের উদ্দেশে গমন করিতেন।

বর্ষাকালের চতুর্মাস অন্তে বর্ধমান অস্থিকগ্রাম হইতে প্রস্থান করিয়া নানাস্থানে পরিব্রজন করিতে লাগিলেন। এ সময়ে তিনি কখনও ১৫ দিন উপবাস করিয়া কখনও বা একমাস উপবাস করিয়া পারণ করিতেন। ক্রমে নালন্দায় উপস্থিত হইয়া দ্বিতীয় বর্ষা চতুর্মাস অতিবাহিত করেন। আজীবক সম্প্রদায়ের ভাবী প্রতিষ্ঠাতা **মংখলীপুত্র গোশালক** তখন এক যুবক ভিক্ষুরূপে নালান্দায় চতুর্মাস যাপন করিতেছিলেন। তিনি বর্ধমানের তপস্যা, ধ্যান ও নিস্পৃহতায় প্রভাবিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার

করিলেন। চতুর্মাসান্তে বর্ধমান নালন্দা পরিত্যাগ করিলেন ও কোল্লাগ সন্নিবেশে গমন করিয়া বহুল নামক ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা করিয়া একমাসব্যাপী উপবাসের পারণ করেন।

গোশালকের সহিত নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে বর্ধমান চম্পা নগরীতে গমন করিয়া তথায় তৃতীয় চতুর্মাস যাপন করেন। এই সময়ে তিনি দুইমাস যাবৎ উপবাস প্রভৃতি অধিকতর কঠোর তপস্যা ও ধ্যান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে নানাপ্রকার কঠোর তপস্যা ও ধ্যানাদি করিতে করিতে শ্রমণ বর্ধমান নানাস্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ষষ্ঠবর্ষে গোশালক তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান কিন্তু ছয়মাস পরে আবার তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং বর্ধমানের দীক্ষাগ্রহণের দশমবর্ষে পুনরায় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া স্বয়ং **আজীবক** ধর্মসম্প্রদায়ের নেতারূপে নিজেকে তীর্থঙ্কর বলিয়া প্রচার করেন।

শ্রমণ বর্ধমান দীক্ষা গ্রহণের পর পঞ্চমবর্ষে ও পুনরায় নবমবর্ষে রাঢ়দেশে ও তদন্তর্গত বজ্জভূমি (বজ্র-ভূমি—বীরভূম?) ও সুহ্মভূমিতে (সিংহভূমি—সিংভূম?) গমন করেন। এই সমস্ত স্থানে তাঁহার উপর বহু অমানুষিক অত্যাচার ও উৎপাত হয়, কিন্তু তিনি সমস্ত কষ্ট শান্ত-চিত্তে সহ্য করেন।

বৌদ্ধশাস্ত্রে যেরূপ বুদ্ধদেবকে মার নানা প্রলোভনে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে, তদ্রূপ জৈন শাস্ত্রেও নানা দেব আসিয়া বর্ধমানের উপর ভীষণ অত্যাচার করতঃ তাঁহাকে সংযম মার্গ হইতে ভ্রষ্ট করিবার অপচেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। এই অত্যাচার সমূহের (যাহাকে জৈন পরিভাষায় **উপসর্গ** বলে) মধ্যে দীক্ষা গ্রহণের একাদশবর্ষে সংগমক নামক দেব

কর্তৃক অনুষ্ঠিত উপসর্গই অত্যন্ত ভীষণ হইয়াছিল। সংগমক প্রথমে তাঁহাকে ভয়ানক শারীরিক কষ্ট প্রদান করে কিন্তু তাহাতে তাঁহাকে বিচলিত করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি ভিক্ষার্থ গমন করিলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া ভিক্ষান্ন দূষিত করিতে লাগিল। বর্ধমান শান্ত-চিত্তে ভিক্ষা হইতে নিবৃত্ত হইয়া ধ্যান করিতে থাকিতেন।

এইরূপে ছয়মাস কাল পর্যন্ত ঘোর উপদ্রব করিয়া তাঁহাকে সামান্য মাত্রও বিচলিত করিতে অসমর্থ হইয়া সংগমক নিজের নির্বুদ্ধিতা লক্ষ্য করিল এবং বর্ধমানের চরণে নিপতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা পূর্বক নিজস্থানে প্রত্যাবর্তন করিল। সংগমকের প্রস্থানের পর বর্ধমান ব্রজ-ধামে ছয়মাসের উপবাসের পারণ করেন।

একস্থানে রাজপুরুষেরা তাঁহাকে চোর মনে করিয়া ফাঁসি দিতে উদ্যত হয় কিন্তু ফাঁস ক্রমান্বয়ে সাতবার ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় তাহারা আশ্চর্য ও ভীত হইয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেয়। এরূপ স্থলে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে তিনি কোন প্রকার উত্তর বা পরিচয় প্রদান করিতেন না বা কোন প্রকার নিষেধাদি করিতেন না, মাত্র মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন।

দীক্ষার দ্বাদশবর্ষে কৌশাম্বীতে গমন করিয়া বর্ধমান প্রতিজ্ঞা করিলেন যে দাসত্ব প্রাপ্ত কোন রাজকুমারী মুণ্ডিত মস্তক, পদদ্বয়ে শৃঙ্খল পরিহিত, তিনদিনের উপবাসক্লিষ্টা ও রোরুদ্যমান অবস্থায় তাঁহাকে সূর্পের কোণে রক্ষিত মাষকলাই সিদ্ধ ভিক্ষা দিলেই পারণ করিবেন, নতুবা উপবাস করিতে থাকিবেন। এইরূপ একান্ত কঠোর প্রতিজ্ঞাকে জৈন পরিভাষায় **অভিগ্রহ** বলে। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি প্রতিদিন কৌশাম্বীতে ভিক্ষার্থ গমন করিতেন এবং প্রতিজ্ঞানুরূপ ভিক্ষা না

পাওয়ায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রশান্ত মনে ধ্যান করিতে থাকিতেন। এই প্রকারে পাঁচমাস ২৫ দিন অনাহারে থাকিবার পর ধনাবহ শ্রেষ্ঠীর গৃহে অঙ্গদেশের রাজা দধিবাহনের কন্যা দাসত্ব প্রাপ্ত **চন্দনার** হস্ত হইতে মাষ-কলাই সিদ্ধ ভিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া পারণ করেন।

কৌশাম্বী হইতে প্রস্থান করিয়া বর্ধমান নানা গ্রাম, নগর পরিভ্রমণ করিতে করিতে চম্পা নগরীতে আসিয়া স্বাতিদত্ত নামক ব্রাহ্মণের যজ্ঞশালায় বর্ষা চতুর্মাস যাপন করেন। স্বাতিদত্ত আত্মা কি, আত্মার স্বরূপ ও লক্ষণ কি ইত্যাদি প্রশ্ন করিলে তিনি 'আমি' এই শব্দের দ্বারা যাহার প্রতীতি হয় সেই 'আত্মা' ইত্যাদি উত্তর প্রদান করায় স্বাতিদত্ত সন্তুষ্ট হন। তৎপরে চতুর্মাস অন্তে চম্পা হইতে প্রস্থান করিয়া বিচরণ করিতে করিতে বর্ধমান ছম্মানী নামক এক গ্রামে আসিয়া তাহার বহির্ভাগে ধ্যানমগ্ন হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ সময়ে একজন গোচারক আসিয়া তাহার বলীবর্দকে তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া গ্রামে গমন করে। বলীবর্দ চরিতে চরিতে দূরে চলিয়া গেল। গোচারক প্রত্যাগমন করিয়া সে স্থলে বলীবর্দকে দেখিতে না পাইয়া বর্ধমানকে উহার বিষয় জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু তিনি কোন উত্তর না দেওয়ায় সে ক্রোধান্ধ হইয়া একটি বৃক্ষ হইতে শাখা কর্তন পূর্বক তাহার দ্বারা কীলক প্রস্তুত করিয়া তাঁহার উভয় কর্ণরন্ধ্রে সজোরে প্রবেশ করাইয়া দেয়। ক্রমে তাঁহার উভয় কর্ণই ভীষণভাবে ফুলিয়া উঠে। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার চিত্তে ও প্রশান্ত মনে সেই তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করিতে থাকিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। ছম্মানী গ্রাম হইতে প্রস্থান করিয়া তিনি মধ্যমা পাবাতে গমন করেন। সেখানে খরক নামক বৈদ্য তাঁহার কর্ণের অবস্থা দেখিয়া সিদ্ধার্থ নামক এক বণিকের

সাহায্যে শল্য দুইটি বাহির করে ও ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ক্ষতস্থান নিরাময় করে।

এইরূপে ভীষণ কষ্ট, যন্ত্রণা ও নির্যাতন সমভাব অবলম্বন পূর্বক অবিচলিত ভাবে সহ্য করিতে থাকায় শ্রমণ বর্ধমান **মহাবীর** নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন।

মহাবীর অনুপম জ্ঞান, অনুপম দর্শন, অনুপম চরিত্র, অনুপম সরলতা, লঘুতা, ক্ষান্তি, মুক্তি, গুপ্তি, তুষ্টি, সত্য, সংযম ও তপস্যার দ্বারা নিজের আত্মাকে বাসিত করিয়া সুদীর্ঘ বার বৎসরেরও অধিক কাল অতিবাহিত করিলেন। সাধক জীবনের ত্রয়োদশ বর্ষে উপনীত হইয়া পরিভ্রমণ করিতে করিতে তিনি ঋজুবালুকা নদীর তীর-বর্তী **জম্ভীয়** গ্রামের বহির্ভাগে বৈয়াবৃত্ত নামক যক্ষের মন্দিরের নিকট সামাগ (শ্যামাক) নামক গৃহপতির ক্ষেত্রে, বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে দিবাভাগের চতুর্থ প্রহরে উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রে শালবৃক্ষের নিম্নে, দুইদিবস ব্যাপী নির্জল উপবাসী অবস্থায় ধ্যান করিতে করিতে **কেবল-জ্ঞান** প্রাপ্ত হইলেন। আকাশে দেবদুন্দুভি নিনাদিত হইল। "তখন শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর অর্হৎ, জিন, কেবলী, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী হইলেন। দেব, মনুষ্য, অসুর সহিত সমস্ত লোকের পর্যায় (অবস্থান্তর) জ্ঞাত হইলেন ও তাহা দেখিতে পাইলেন। সমস্ত লোকে সমস্ত জীবের আগতি, গতি, স্থিতি, চ্যবণ (এক জন্ম হইতে অন্য জন্মে গমন), উপপাত (দেব বা নারক যোনিতে উৎপত্তি), তর্ক, মন, মানসিক (মানসিক চিন্তা), ভুক্ত, কৃত, প্রতি-সেবিত, প্রকাশ্যে কৃত কার্য, গোপনে কৃত কার্য সমস্তই তাঁহার গোচরীভূত হইল। তাঁহার নিকট কোন কিছুই আর গুপ্ত থাকিল না এবং তাঁহারও কোন কার্য গোপনীয় থাকিল না। সমস্তলোকে সমস্ত জীবের সেই সেই কালের

মন-বচন-কায়ের সমস্ত প্রবৃত্তি ও ভাব জানিতে ও দেখিতে থাকিয়া তিনি বিচরণ করিতে লাগিলেন।" (কল্পসূত্র—১২১)

তীর্থঙ্কর জীবন

এইবার ভগবান্ মহাবীরের তীর্থঙ্কর জীবন আরম্ভ হইল। কেবল-জ্ঞান প্রাপ্তির পর সেই রাত্রে তিনি জম্ভীয়-গ্রাম হইতে প্রয়াণ করিয়া পরদিন প্রভাতে মধ্যমা পাবাতে আগমন পূর্বক মহাসেন নামক উদ্যানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীরের আগমন সংবাদে দলে দলে লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে ও তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে সেই উদ্যানে একত্রিত হইতে লাগিল। মহাবীর এক প্রহর পর্যন্ত উপদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহার জ্ঞান ও মধুর বচনের প্রভাবে জনতা মুগ্ধ হইয়া গেল। চতুর্দিকে তাঁহার সর্বজ্ঞতার ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের খ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তিনি প্রচলিত প্রথা ভঙ্গ করিয়া সংস্কৃতের পরিবর্তে লোকভাষায় উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। এই ভাষাকে **অর্ধ-মাগধী** বলে। সমস্ত জৈন আগম শাস্ত্র এই অর্ধ-মাগধী ভাষায় রচিত।

এ সময়ে মধ্যমা পাবাতে সোমিলাচার্য নামক এক ব্রাহ্মণের গৃহে যজ্ঞ হইতেছিল। এই যজ্ঞে যোগদান করিবার জন্য দেশদেশান্তর হইতে বেদ-বেদাঙ্গ পারদর্শী বহু ব্রাহ্মণাচার্য আসিয়াছিলেন। মহাবীরের প্রশংসা করিতে করিতে বহুলোক তাঁহার উপদেশ সভায় গমন করিতেছিল এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞে সমাগত **ইন্দ্রভূতি গৌতম** নামক একজন বিখ্যাত ব্রাহ্মণ আচার্যের মনে হইল যে হয়ত কোন ঐন্দ্রজালিক এখানে আসিয়া মনুষ্যগণকে মোহিত করিতেছে।

তিনি তখনই যাইয়া ঐ ঐন্দ্রজালিকের চাতুরী প্রকাশ করিয়া ও তাহাকে তর্কে পরাস্ত করিয়া জনতার ভ্রম দূর করিয়া দিতে ইচ্ছা করিলেন। এইরূপে তিনি তাঁহার ৫০০ জন শিষ্য সহ মহাবীরের নিকটে গমন করেন।

মহাসেন উদ্যানের উপদেশ সভায় প্রবেশ করিয়াই মহাবীরের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও যোগৈশ্বর্যে ইন্দ্রভূতি গৌতম অভিভূত হইয়া পড়িলেন। মহাবীর গৌতমকে আগত দেখিয়াই তাঁহাকে নাম ধরিয়া আহ্বান করিলেন। গৌতমের মনে যে সন্দেহ ছিল তাহা তিনি প্রকাশ করিয়া বলিলেন—হে গৌতম, তোমার মনে আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। বেদে বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি,[১৬] এই বাক্যের অর্থে তুমি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছ যে পঞ্চভূত হইতেই বিজ্ঞানঘন আত্মার উৎপত্তি হয় ও পরে পঞ্চভূতেই সেই আত্মার বিনাশ হয়, পরলোক বলিয়া কিছুই নাই। অতএব পঞ্চভূতের অতিরিক্ত কোন পৃথক পুরুষ নাই, অথচ সবৈ অয়মাত্মা জ্ঞানময়ঃ ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে আত্মার অস্তিত্ব পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত হইয়াছে তাহাও তুমি অবগত আছ। এই উভয় প্রকার বেদবাক্যে তোমার মনে সংশয় উৎপন্ন হইয়াছে যে বাস্তবিক আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ আছে কিনা। কিন্তু বিজ্ঞানঘন ইত্যাদি বাক্যের তুমি যে অর্থ মনে করিয়াছ তাহা ঠিক নয়। বিজ্ঞানঘন শব্দের অর্থ অনন্ত-জ্ঞান-দর্শন-উপযোগাত্মক আত্মা এবং ভূত শব্দের অর্থ কেবল মাত্র পঞ্চভূত নয় কিন্তু সমস্ত জড়চেতনরূপ জ্ঞেয় পদার্থ। অতএব এই বাক্যের অর্থ—বিভিন্ন জ্ঞেয় পদার্থ হইতে অনন্ত-জ্ঞান-দর্শন-

১৬। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্—২।৪।১২

উপযোগাত্মক আত্মায় বিভিন্ন জ্ঞান পর্যায়ের উৎপত্তি হয় এবং যে সমস্ত জ্ঞেয় পদার্থ হইতে জ্ঞান পর্যায়ের উৎপত্তি হইয়াছিল সেই সেই জ্ঞেয় পদার্থ ব্যবহিত বা বিনষ্ট হইলে তজ্জন্য আত্মায় যে যে জ্ঞান পর্যায়ের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহাও তিরোহিত বা বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না। ইহাই বেদবাক্যের অর্থ এবং আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নাই।

মহাবীরের এইরূপ সমন্বয়াত্মক ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া এবং কথিত না হইয়াও তাঁহার মনের মধ্যে লুক্কায়িত সংশয়ের কথা প্রকাশ করায় ইন্দ্রভূতি মহাবীরের সর্বজ্ঞতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইলেন। তিনি মহাবীরের নিকট হইতে নির্গ্রন্থ ধর্মের প্রবচন শ্রবণ করিবার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিলেন। মহাবীর তাঁহাকে নির্গ্রন্থ ধর্মের উপদেশ প্রদান করিলেন। উপদেশ শ্রবণে গৌতমের হৃদয়ে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইল এবং তিনি ৫০০ জন শিষ্য সহ ভগবানের নিকট শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ইনিই মহাবীরের প্রথম শিষ্য এবং প্রথম ও প্রধান গণধর। জৈন সাহিত্যে ইনি গৌতম বা **গৌতম স্বামী** নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। ভগবান্ মহাবীর উপদেশ প্রদান করিবার সময় ইঁহাকেই সম্বোধন করিয়া উপদেশ দিতেন।

ইন্দ্রভূতির নির্গ্রন্থ ধর্মগ্রহণের সংবাদ পাবাতে শীঘ্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। যজ্ঞে সমাগত ব্রাহ্মণগণ এই সংবাদে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। ইন্দ্রভূতি গৌতমের ভ্রাতা অদ্বৈতবাদী **অগ্নিভূতি** কম বিদ্বান্ ছিলেন না। তিনি ভ্রাতার পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে উত্থিত হইলেন ও মহাবীরকে তর্কে পরাস্ত করিয়া ভ্রাতা ইন্দ্রভূতিকে ফিরাইয়া আনিতে ৫০০ জন শিষ্য সহ মহাসেন উদ্যানাভি-মুখে গমন করিলেন।

মহাবীরের সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার মহান্ যোগৈশ্বর্যে ইন্দ্রভূতির ন্যায় অগ্নিভূতিও অভিভূত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু তিনি কর্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বহুবিধ তর্ক করিলেন। ভগবান্ মহাবীর বেদবাক্যের নবীন অর্থ করিয়া অগ্নিভূতির সমস্ত সন্দেহ নিরাকরণ করিলেন এবং তর্কে তাঁহাকে নিরুত্তর করিয়া কর্মের অস্তিত্ব ও আত্মার সহিত কর্মের বন্ধ প্রতিপাদন করিলেন। অগ্নিভূতি তর্কে পরাজিত ও মহাবীরের সর্বজ্ঞতা সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় হইয়া তাঁহার নিকট সশিষ্য শ্রমণদীক্ষা গ্রহণ করিলেন এবং দ্বিতীয় গণধর পদে স্থাপিত হইলেন।[১৭]

এইরূপে **বায়ুভূতি গৌতম, আর্যব্যক্ত, সুধর্ম, মণ্ডিত, মৌর্যপুত্র, অকম্পিত, অচলভ্রাতা, মেতার্য,** ও **প্রভাস** আরও এই **নয়জন** ব্রাহ্মণ পণ্ডিত একে একে তর্ক করিতে আসিয়া মহাবীরের নিকট নির্গ্রন্থ ধর্ম অঙ্গীকার করেন ও গণধর রূপে স্থাপিত হন। ইন্দ্রভূতি ও অগ্নিভূতি সহ এই নয়জন মিলিয়া সর্বসমেত একাদশ জন গণধর স্থাপিত হইলেন। ইঁহাদের সকলেরই মনে বিভিন্ন বেদবাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া সংশয় ছিল। ভগবান্ মহাবীর বেদ-বাক্যকে পরস্পর বিরোধী বা মিথ্যা বলিলেন না। কিন্তু তাহাদের নূতন ব্যাখ্যা করিয়া অপূর্বরূপে সমন্বয় সাধন পূর্বক তাঁহাদের সংশয় ছেদন করিয়া দিলেন। এই একাদশ জন গণধরের ৪৪০০ জন শিষ্য ছিলেন, তাঁহারাও সকলে নির্গ্রন্থ ধর্ম গ্রহণ করিলেন।

মধ্যমা পাবা হইতে প্রস্থান করিয়া ভগবান্ রাজগৃহে

১৭। অগ্নিভূতি প্রভৃতি দশজন গণধরের তর্কের বিস্তারিত বিবরণের জন্য আবশ্যক নির্যুক্তি কল্প সূত্রের টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

গমন করেন ও তথায় **গুণশীল চৈত্য**[১৮] নামক উদ্যানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সে সময়ে শিশুনাগ বংশীয় মহারাজ শ্রেণিক (বিম্বিসার) মগধে রাজত্ব করিতেছিলেন। মহাবীরের আগমন সংবাদে মহারাজ শ্রেণিক ও চেল্লনাদি রাজ্ঞীগণ, অভয়কুমারাদি কুমারগণ, বহু রাজকর্মচারী, শ্রেষ্ঠী ও নাগরিকগণ দলে দলে তাঁহার উপদেশ সভায় সমবেত হইলেন। তিনি আত্মার অস্তিত্ব, কর্মের দ্বারা আত্মার বন্ধ ও তজ্জনিত জন্ম-জরা-মৃত্যুরূপ সংসারে পরিভ্রমণ, মনুষ্য জন্মই একমাত্র অবস্থা যাহা আশ্রয় করিয়া আত্মা মুক্তিলাভ করিতে পারে ইত্যাদি নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করিলেন। সাধুগণের জন্য অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহরূপ পঞ্চমহাব্রত প্রচার করিলেন। প্রত্যেক সাধু বা সাধ্বীকে এই পাঁচটি মহাব্রত মন-বচন-কায়ের দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে পালন করিতে হইবে এইরূপ নিয়ম করা হইল। কোনও সাধু হিংসা, অসত্য, চৌর্য, অব্রহ্মচর্য সেবন ও পরিগ্রহ সঞ্চয় স্বয়ং করিবে না, অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা করাইবে না বা অন্য কেহ তদ্রূপ করিলে তাহা অনুমোদন করিবে না।

গৃহস্থগণের পক্ষে এরূপ মহাব্রত সম্পূর্ণরূপে পালন করা সম্ভব নয় বলিয়া তাহাদের জন্য অহিংসাদি আংশিক-

১৮। বর্তমান নওয়াদা (Nawada, E. I. Ry.) ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে গুণায়া নামক স্থানটি পুরাকালের গুণশীল চৈত্য বলিয়া কথিত। এখানে মহাবীরের একাদশ জন গণধরই মুক্তি লাভ করেন। ইহাও একটি জৈন তীর্থস্থান। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে গুণায়া গুণশীল চৈত্য নহে, তাঁহারা রাজগৃহের বিপুল গিরিকে গুণশীল চৈত্য বলিয়া থাকেন।

রূপে পালন করিবার নিয়ম[১৯] প্রচার করিলেন। এইরূপে তীর্থঙ্কর মহাবীর সাধু, সাধ্বী, শ্রাবক (গৃহস্থ) ও শ্রাবিকারূপ চতুর্বিধ সংঘের স্থাপন করিলেন। মহাবীরের উক্তরূপ উপদেশের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া রাজকুমার মেঘ প্রভৃতি অনেকে সাধু ধর্মে দীক্ষিত হইলেন, রাজকুমার অভয়াদি অনেকে শ্রাবক ধর্ম গ্রহণ করেন ও মহারাজ শ্রেণিকাদি বহুব্যক্তি নির্গ্রন্থ ধর্মে শ্রদ্ধান্বিত হন।

রাজগৃহের গুণশীল চৈত্যে বর্ষা চতুর্মাস যাপন করিয়া মহাবীর বিদেহ দেশের অভিমুখে প্রয়াণ করিলেন ও বৈশালীর নিকটবর্তী ব্রাহ্মণ কুণ্ডগ্রামে উপস্থিত হইয়া তাঁহার জামাতা জমালি ও কন্যা প্রিয়দর্শনাকে নির্গ্রন্থ ধর্মে দীক্ষিত করেন। বৈশালীতে বর্ষা চতুর্মাস যাপন করিয়া বৎস্য দেশ ও তথা হইতে উত্তর কোশল প্রদেশে গমন করেন। এই সমস্ত স্থলে বহু ব্যক্তি তাঁহার উপদেশে নির্গ্রন্থ ধর্ম গ্রহণ করে।

উত্তর কোশল হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভগবান্ বিদেহ প্রদেশের মধ্য হইয়া পুনরায় রাজগৃহে গমন করেন এবং তথায় চতুর্মাস যাপন করিয়া অঙ্গদেশের রাজধানী চম্পায় গমন করেন। এ সময়ে সিন্ধু-সৌবীর দেশে **রুদ্রায়ণ** (বা উদায়ন) নামক রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি মহাবীরের ধর্ম-প্রচারের সংবাদ শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে ভগবান্ মহাবীর যদি এস্থানে আগমন করেন তবে আমি তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া ধন্য হই। চম্পায় অবস্থানকালে সর্বজ্ঞ ভগবান্ রুদ্রায়ণের মনোভাব অবগত হইয়া সিন্ধু-সৌবীর দেশের রাজধানী বীতভয় পত্তনের অভিমুখে যাত্রা করেন ও তথায় উপস্থিত হইয়া মহারাজ রুদ্রায়ণকে শ্রমণ ধর্মে দীক্ষিত করেন।

১৯। পরিশিষ্ট ক দ্রষ্টব্য।

প্রত্যাবর্তন করিবার সময়ে গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্রে সিন্ধু-দেশের মরুভূমিতে শ্রমণগণ খাদ্য পানীয় অভাবে অত্যন্ত কষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহারা সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিলেন। মহাবীর বীতভয় পত্তন হইতে প্রত্যাগত হইয়া বিদেহ দেশে বাণিজ্য গ্রামে বর্ষা চতুর্মাস যাপন করেন ও তথা হইতে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে বারাণসীতে আগমন করিয়া কোষ্টক চৈত্য নামক উদ্যানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বারাণসীতে বহুব্যক্তি তাঁহার ধর্মে দীক্ষিত হন। তন্মধ্যে কোটিপতি গৃহস্থ চুলনীপিতা ও তাঁহার স্ত্রী শ্যামা এবং সুরদেব ও তাঁহার স্ত্রী ধন্যার নাম উল্লেখযোগ্য।

তিনি বারাণসী হইতে কাশীদেশের অন্যতমা নগরী আলভিয়াতে গমন করেন। সেখানে পোগ্গল নামক একজন বিখ্যাত বৈদিক তপস্বীকে ও চুল্ল শতক ও তাঁহার স্ত্রী বহুলাকে অন্যান্য বহুজনের সহিত তাঁহার প্রচারিত ধর্মে দীক্ষিত করেন। তিনি আলভিয়া হইতে প্রস্থান করিয়া ক্রমে রাজগৃহে উপনীত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

রাজগৃহের নৃপতি শ্রেণিক পূর্বেই নির্গ্রন্থ ধর্মে শ্রদ্ধাবান হইয়াছিলেন। এবার তাঁহার ত্রয়োবিংশতি জন পুত্র ও ত্রয়োদশ জন রাজ্ঞী ও অন্যান্য বহু ব্যক্তি নির্গ্রন্থ ধর্মে দীক্ষিত হইয়া মহাবীরের শ্রমণ সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইলেন। মহাবীর রাজগৃহে দুই বর্ষা চতুর্মাস অতিবাহিত করেন। আর্দ্রক নামক অনার্য দেশের রাজার পুত্র **আর্দ্রককুমার** জাতিস্মরণ জ্ঞান[২০] প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

২০। যে জ্ঞান উৎপন্ন হইলে পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত জানিতে পারা যায় তাহাকে জাতিস্মরণ জ্ঞান বলে।

তিনি ভারতে আগমন করিয়া অন্যের উপদেশ ব্যতিরেকেই স্বয়ং নির্গ্রন্থ ধর্ম অঙ্গীকার করিলেন এবং রাজগৃহে আসিয়া মহাবীরের সাধুসংঘে প্রবিষ্ট হইলেন। আর্দ্রক-কুমার রাজগৃহে আগমন করিবার সময় পথিমধ্যে আজীবক ধর্মের নেতা মঙ্খলী গোশালক, বৌদ্ধভিক্ষু, বৈদিক ব্রাহ্মণ সাংখ্যমতাবলম্বী সন্ন্যাসী ও হস্তী-তাপসাদি[২১] অনেককে তর্কে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদের কতককে শ্রমণধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্য সঙ্গে আনয়ন করেন এবং ভগবান্ মহাবীরের হস্ত দ্বারা তাঁহাদিগকে দীক্ষা প্রদান করাইলেন। রাজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্ ভ্রমণ করিতে করিতে কৌশাম্বী গমন করেন।

কৌশাম্বীতে মহারাজ শতানীকের বিধবা রাজ্ঞী মৃগাবতী ও উজ্জয়িনীর অধিপতি প্রদ্যোতের অঙ্গারিকাদি একাদশ রাজ্ঞী মহাবীরের নিকট দীক্ষালাভ করিয়া তাঁহার সাধ্বী সংঘের অন্তর্ভুক্ত হইলেন। মহাবীর কৌশাম্বী হইতে বৈশালীতে আগমন করিয়া তথায় বর্ষা চতুর্মাস যাপন করেন। চতুর্মাস অন্তে নানাস্থানে পরিব্রজন করিতে করিতে তিনি পোলাসপুর গমন করেন ও তথায় আজীবক সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট শ্রাবক **সদ্দালপুত্রকে** নির্গ্রন্থ ধর্মে দীক্ষিত করেন। ইহার পরে বর্ষা চতুর্মাস বাণিজ্য-গ্রামে অতিবাহিত করিয়া ক্রমে রাজগৃহে উপনীত হইলেন। এস্থলে ত্রয়োবিংশতিতম তীর্থঙ্কর ভগবান্ পার্শ্বনাথের শিষ্যপরম্পরার কতিপয় নির্গ্রন্থ সাধু মহাবীরের নিকট আগমন করেন ও নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে সর্বজ্ঞ,

২১। যাহারা এক বৎসরে একটি হস্তীকে বধ করিয়া সম্বৎসর তাহারই মাংস খাইয়া জীবন যাপন করিত তাহাদিগকে হস্তী-তাপস বলা হইত। সূত্রকৃতাঙ্গ—২।৬

সর্বদর্শী ও তীর্থঙ্কর বলিয়া বিশ্বাস করিয়া পার্শ্বনাথের প্রবর্তিত চতুর্যাম ধর্ম পরিত্যাগ করতঃ মহাবীরের প্রবর্তিত পঞ্চযাম[২২] ধর্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার শ্রমণ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইলেন।

চতুর্মাস অন্তে ভগবান্ রাজগৃহ হইতে প্রস্থান করিয়া পশ্চিমোত্তর প্রদেশ সমূহের নানাস্থানে পরিব্রজন করিয়া কচঙ্গলা নামক এক নগরে আসিয়া তাহার বহির্ভাগে স্থিত ছত্রপলাস নামক উদ্যানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এস্থানে গর্দভালী শিষ্য কাত্যায়ন গোত্রীয় **স্কন্দক** নামক একজন বেদ-বেদাঙ্গ পারদর্শী পরিব্রাজক তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার জ্ঞান ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অভিভূত হইয়া শ্রমণদীক্ষা গ্রহণ করিলেন। কচঙ্গলা পরিত্যাগ করিয়া মহাবীর শ্রাবস্তী হইয়া পুনরায় বাণিজ্যগ্রামে গমন করিয়া বর্ষা চতুর্মাস যাপন করেন। শ্রাবস্তীতে যাঁহারা মহাবীরের ধর্ম গ্রহণ করেন তাঁহাদের মধ্যে গৃহপতি নন্দিনী-পিতা ও তাঁহার স্ত্রী অশ্বিনী এবং গৃহপতি সালিহী-পিতা ও তাঁহার স্ত্রী ফাল্গুনীর নাম উল্লেখনীয়।

চতুর্মাস পরে ভগবান্ ব্রাহ্মণ কুণ্ডগ্রামের বহুশাল চৈত্য

২২। পার্শ্বনাথের সাধুগণ অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ও অপরিগ্রহ এই চারিটি মহাব্রত পালন করিতেন বলিয়া তাঁহাদের ধর্মকে চতুর্যাম ধর্ম বলা হইত। তাঁহারা ব্রহ্মচর্য ব্রতকে অপরিগ্রহ ব্রতেরই অন্তর্ভুক্ত মনে করিতেন কেন না স্ত্রীকে তাঁহারা পরিগ্রহেরই অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করিতেন। মহাবীর এই নিয়মের সংস্কার করিয়া অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটি মহাব্রত প্রচার করেন বলিয়া তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মকে পঞ্চযাম ধর্ম বলা হয়।

নামক উদ্যানে আগমন করেন। এইস্থানে তাঁহার জামাতা জমালি ৫০০ জন শিষ্য সহ মহাবীরের শ্রমণ সংঘ পরিত্যাগ করিয়া পৃথক মত স্থাপন করেন। জমালির মতভেদ মাত্র তর্ক পদ্ধতি লইয়াই ছিল এবং তাঁহার সম্প্রদায় **বহুরত** নামে আখ্যাত হইয়াছিল। বহুরত সম্প্রদায় বিস্তৃতি লাভ ত করেই নাই, বরং জমালির শিষ্যগণ ক্রমে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় মহাবীরের নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ে আসিয়া মিলিত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণ কুণ্ডগ্রাম হইতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে মহাবীর আবার রাজগৃহে গমন করেন ও গুণশীল চৈত্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বর্ষা চতুর্মাস এস্থানে অতিবাহিত করিয়া তিনি অঙ্গদেশের রাজধানী চম্পায় আগমন করেন। শ্রেণিকের পুত্র **কুণিক** বা **অজাতশত্রু** তখন মগধের অধীশ্বর। তিনি রাজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া চম্পায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। অজাতশত্রু বিশেষ আড়ম্বরের সহিত মহাবীরকে বন্দনা করিতে গমন করেন। এস্থলে বহু রাজকুমার, শ্রেষ্ঠী ও নাগরিকগণ তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করেন।

চম্পা হইতে বিদেহ দেশে গমন করিয়া মহাবীর মিথিলাতে বর্ষা চতুর্মাস যাপন করেন। মিথিলা হইতে পুনরায় চম্পায় আগমন করেন। এ সময়ে মগধের অধিপতি অজাতশত্রু বজ্জীগণ[২৩] ও দক্ষিণাপথের কোন নৃপতির সাহায্য লইয়া বিপুল সৈন্যসহ বৈশালী আক্রমণ করেন এবং কাশী ও কোশলদেশের মল্ল ও লিচ্ছবীগণের অষ্টাদশ গণরাজের সম্মিলিত বাহিনীকে কয়েক দিবসব্যাপী ভীষণ

২৩। মূলগ্রন্থে দেবরাজ ইন্দ্র ও অসুরেন্দ্র চমরের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন লিখিত আছে।

যুদ্ধে[২৪] পরাস্ত করিয়া বৈশালী গণরাজ্যের প্রধান অধিনায়ক মহারাজ চেটককে নিহত করেন ও বৈশালী নগর ধ্বংস করেন। চম্পায় মহারাজ শ্রেণিকের কয়েকজন বিধবা রাজ্ঞী ও অন্যান্য অনেকে ভগবানের সাধু সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়াছিলেন। চম্পা হইতে পুনরায় মিথিলায় গমন করিয়া মহাবীর তথায় বর্ষা চতুর্মাস যাপন করেন ও তথা হইতে শ্রাবস্তীতে আগমন করিয়া কোষ্টক চৈত্য নামক উদ্যানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

আজীবক সম্প্রদায়ের নেতা মঙ্খলীপুত্র গোশালকও তখন শ্রাবস্তীতে হালাহলা নাম্নী কুম্ভকার পত্নীর ভাণ্ডাগারে অবস্থান করিতেছিলেন। গোশালক যখন মহাবীরের শিষ্যরূপে তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন তখন তেজোলেশ্যা[২৫] সাধন করিবার প্রণালী তাঁহার নিকট জানিয়া লইয়াছিলেন এবং পরে তাহা সিদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি নিমিত্ত শাস্ত্রও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং সেই জ্ঞানের দ্বারা ভূত ও ভবিষ্যৎ ঘটনা বলিয়া দিতে পারিতেন। এইরূপে তপস্তেজে বলীয়ান ও নিমিত্তজ্ঞ হইয়া তিনি নিজেকে তীর্থঙ্কর বলিয়া প্রচার করিলেন ও আজীবক সম্প্রদায়ের নেতা হইলেন।

ঘটনাক্রমে নির্গ্রন্থ তীর্থঙ্কর ভগবান্ মহাবীর ও আজীবক তীর্থঙ্কর গোশালক একই সময়ে শ্রাবস্তীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রসঙ্গক্রমে মহাবীর উপদেশ

২৪। নিরয়াবলী ও ভগবতী সূত্র নামক প্রাচীন গ্রন্থে মহাশীলা কণ্টক ও রথমুষল সংগ্রাম নামে বর্ণিত আছে।

২৫। তপোলব্ধ এক প্রকার শক্তি। এই শক্তির প্রভাবে কোনও প্রাণী বা মনুষ্যকে বা ক্ষুদ্র বৃহৎ যে কোনও বস্তুকে ভস্ম করিতে পারা যায়।

সভার মধ্যে গোশালকের পূর্ব-বৃত্তান্ত বিবৃত করেন। তিনি ইহাও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে গোশালক কেবলজ্ঞান সম্পন্ন সর্বজ্ঞ বা তীর্থঙ্কর নহে। এই কথা শ্রাবস্তীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং গোশালকেরও কর্ণগোচর হইল। গোশালক ইহাতে নিজেকে অপমানিত মনে করিয়া শিষ্যগণসহ মহাবীরের উপদেশ সভায় উপস্থিত হইলেন। উভয় তীর্থঙ্করের বিবাদ শ্রবণ করিতে বহুলোক সেই স্থলে একত্রিত হইল। মহাবীরের নিকট উপনীত হইয়া তিনি মহাবীরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে কাশ্যপ, তুমি কি এরূপ প্রচার করিয়াছ যে আমি তোমার শিষ্য মঙ্খলীপুত্র গোশালক? হে আয়ুষ্মন্, এরূপ যদি তুমি ব্যক্ত করিয়া থাক তবে ইহা তোমার ভুল। কেন না তোমার শিষ্য গোশালক বহুদিন হইল মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। আমি উদায়ী কুণ্ডিয়াযান নামক ধর্মপ্রবর্তক। আমি এক শরীর জীর্ণ হইলে অন্য কার্যক্ষম শরীরে প্রবেশ করি। বর্তমানে মৃত গোশালকের শরীর কর্মঠ ও বলবান্ দেখিয়া আমি তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছি। ইহা আমার সপ্তম শরীরান্তর প্রবেশ। এই শরীরে আরও ষোড়শ বৎসর অবস্থান করিয়া মুক্তিপ্রাপ্ত হইব। গোশালকের বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাবীর উত্তর প্রদান করিলেন—হে গোশালক, তুমিই আমার শিষ্য মঙ্খলীপুত্র গোশালক, কেন বৃথা আত্মগোপন করিতেছ? মহাবীরের উত্তরে গোশালক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি অপশব্দ প্রয়োগ করিতে লাগিল। মহাবীরের সাধু সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে সর্বানুভূতি ও সুনক্ষত্র নামক দুইজন সাধু গোশালকের কটুবচন সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করায় গোশালক তেজোলেশ্যা প্রয়োগ করিয়া সেই দুই জন সাধুকে ভস্মী-

ভূত করিয়া দিল। গোশালক আসিবার পূর্বেই মহাবীর তাঁহার সাধুগণকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে তাহার সহিত যেন কেহ তর্কাদি না করে, কারণ সে তেজোলেশ্যার দ্বারা ভস্ম করিতে সমর্থ। কিন্তু এই দুইজন সাধু তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও উত্তেজিত হইয়া গোশালকের সহিত তর্ক করিতে যাওয়ায় তৎকর্তৃক নিহত হইল।

তৎপরে গোশালক স্বয়ং মহাবীরের উপর তেজোলেশ্যা প্রয়োগ করিল কিন্তু মহাবীরের তপস্তেজের প্রভাবে তাঁহার শরীর হইতে প্রতিহত হইয়া গোশালকের শক্তি তাহার নিজের শরীরেই প্রবেশ করিয়া জ্বালা উৎপাদন করিতে লাগিল। গোশালক মহাবীরকে সম্পূর্ণ অবিচলিত দেখিয়া বলিল—হে কাশ্যপ, আমার তপস্তেজের প্রভাবে তুমি ছয়মাসের মধ্যে পিত্তজ্বরে পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। মহাবীর উত্তর করিলেন—হে গোশালক, আমি এখনও ষোল বৎসর বাঁচিয়া থাকিব কিন্তু তুমি তোমারই তপস্তেজের দ্বারা প্রহত হইয়া অদ্য হইতে সাত-দিনের মধ্যে দাহজ্বরে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। গোশালক তপঃশক্তির অপব্যয় করিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল এবং দাহজ্বরে আক্রান্ত হইয়া সপ্তম দিনে মৃত্যু প্রাপ্ত হইল।

শ্রাবস্তী হইতে প্রস্থান করিয়া ভগবান্ মেণ্ঢিয় গ্রামে গমন করেন ও তথা হইতে পুনরায় মিথিলায় গমন করিয়া বর্ষা চতুর্মাস যাপন করেন। মেণ্ঢিয় হইতে প্রয়াণ করিয়া তিনি ধীরে ধীরে পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ইতিমধ্যে তাঁহার প্রথম গণধর ইন্দ্রভূতি গৌতম শিষ্যগণ সহ শ্রাবস্তীতে গমন করিয়া কোষ্টক উদ্যানে অবস্থান করিলেন।

ত্রয়োবিংশতিতম তীর্থঙ্কর ভগবান্ পার্শ্বনাথের শিষ্য

পরম্পরার আচার্য **কেশীকুমারও** তখন শিষ্যগণসহ শ্রাবস্তীতে তিন্দুক উদ্যানে অবস্থান করিতেছিলেন। সময়জ্ঞ গৌতম গণধর তিন্দুকোদ্যানে যাইয়া কেশীকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও তাঁহার প্রশ্নাবলীর যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়া ভগবান্ মহাবীর যে চতুর্বিংশতিতম তীর্থঙ্কর তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিলেন। কেশী-কুমার শিষ্যগণ সহ মহাবীরের সাধু সম্প্রদায়ে মিলিত হইলেন।

মহাবীর শ্রাবস্তীতে আগমন করিয়া কয়েক দিবস অবস্থানের পর অহিচ্ছত্র নগরে ও তথা হইতে হস্তিনাপুর গমন করিয়া সহস্রাম্রবন নামক উদ্যানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সে সময়ে হস্তিনাপুরের রাজা শিব তাঁহার পুত্রকে রাজ্য প্রদান করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্বক তপো-বনে বাস করিতেছিলেন। মহাবীরের আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া **শিবরাজর্ষি** তাঁহার নিকট উপস্থিত হন ও তাঁহার উপদেশের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া শ্রমণ সংঘে প্রবিষ্ট হন এবং ক্রমে কর্মক্ষয় করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হন।

এইরূপে অঙ্গ, মগধ, বিদেহ, কোশল, কাশী, বৎস, পাঞ্চাল প্রভৃতি দেশে বিচরণ করিয়া মহাবীর উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। বহু পরিব্রাজক, বেদজ্ঞপণ্ডিত, আজীবক মতাবলম্বী প্রভৃতি নানামতের নানা সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ আসিয়া তাঁহাকে নানা প্রকারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন এবং তাঁহার উত্তরে সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত হইয়া নির্গ্রন্থ ধর্ম গ্রহণ করিতেন। এই সমস্ত প্রশ্নোত্তরের সময় তিনি জীব, জীবাত্মা, কর্ম, কালচক্র, পঞ্চাস্তিকায়, স্যাদ্বাদ প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁহার মত বিবৃত করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিবৃতি জৈন আগম গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ত্রয়ো-বিংশতিতম **তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের** শিষ্য পরম্পরার বহু

শ্রমণ মহাবীরকে চতুর্বিংশতিতম তীর্থঙ্কর স্বীকার করিয়া তাঁহার শ্রমণ সম্প্রদায়ে মিলিত হইয়াছিলেন।

এইরূপে ধর্মপ্রচার করিতে করিতে ভগবান্ মহাবীরের কেবল-জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার পর তীর্থঙ্কর জীবনের ত্রিশ-বৎসর অতিবাহিত হইল। তিনি শেষ বর্ষা চতুর্মাস **মধ্যমা পাবাতে** যাপন করিতেছিলেন। এইস্থানে থাকিতে থাকিতে কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে শেষরাত্রে সূর্যোদয়ের প্রাক্‌কালে উপদেশ প্রদানরত অবস্থায় ৭২ বৎসর বয়সে খৃঃ পূঃ ৫২৭ অব্দে বা বিক্রম সংবতের ৪৭০ বৎসর পূর্বে ভগবান্ মহাবীর দেহত্যাগ করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হন। তাঁহার নির্বাণের বিবরণ জৈনশাস্ত্রে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছেঃ

"তৎপরে ভগবান্ মধ্যমা-পাবাতে হস্তিপাল রাজার শুল্কশালায় শেষ বর্ষাকাল যাপন করিবার জন্য উপাগত হইলেন।" (কল্পসূত্র—১২৩)

"সেই চতুর্মাসের চতুর্থ মাসে সপ্তম পক্ষে কার্তিক কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চদশম দিবসে যে চরম রাত্রি সেই রাত্রিতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর কালগত হইলেন, সংসার হইতে ব্যতিক্রান্ত হইলেন, অপুনরাবর্তরূপে ঊর্ধ্বে গমন করিলেন। জন্ম-জরা-মরণ বন্ধন ছিন্ন করিয়া **সিদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, অন্তকৃৎ, পরিনির্বৃত, সর্বদুঃখপ্রহীণ হইলেন।**" (কল্পসূত্র—১২৪)

যে সময় ভগবান্ মহাবীর নির্বাণ প্রাপ্ত হন সে সময়ে কাশী দেশের নয়জন মল্ল গণরাজ ও কোশল দেশের নয়-জন লিচ্ছবী গণরাজ তথায় উপস্থিত ছিলেন। ভগবানের তিরোধানে জ্ঞানের আলোক অস্তমিত হইল বলিয়া তাঁহারা

প্রদীপ জ্বালাইয়া দ্রব্যের আলোক[২৬] করিলেন। তখন হইতে কার্তিক মাসের অমাবস্যা রজনীতে **দীপোৎসব** প্রবর্তিত হইল।

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর গৃহত্যাগ করিয়া দীক্ষাগ্রহণের পর ৪২ বৎসর জীবিত ছিলেন, এই ৪২ বৎসরের ৪২ বর্ষা চতুর্মাস নিম্নলিখিত স্থান সমূহে অতিবাহিত করেনঃ

অস্থিক গ্রামে	১	বর্ষা চতুর্মাস
চম্পা ও পৃষ্ঠ চম্পায়	৩	"
বৈশালী ও বাণিজ্যগ্রামে	১২	"
রাজগৃহ ও নালন্দায়	১৪	"
মিথিলাতে	৬	"
ভদ্রিকা নগরীতে	২	"
আলম্ভিয়া নগরীতে	১	"
শ্রাবস্তীতে	১	"
পণিয়ভূমিতে (বজ্রভূমি)	১	"
মধ্যমা পাবাতে	১	"

তিনি বর্ষা চতুর্মাসের চারিমাস কাল একস্থানে থাকিতেন, অন্য সময়ে স্থান বিশেষে কয়েক দিবস থাকিয়া প্রস্থান করিতেন।

মহাবীরের ইন্দ্রভূতি গৌতম প্রমুখ সাধুগণের সংখ্যা ১৪০০০, আর্যা চন্দনা প্রমুখ সাধ্বীগণের সংখ্যা ৩৬০০০, শঙ্খ ও শতক প্রমুখ ব্রতধারী শ্রমণোপাসক-গণের সংখ্যা ১৫৯০০০ এবং সুলসা ও রেবতী প্রমুখ ব্রতধারিণী শ্রাবিকাগণের সংখ্যা ৩১৮০০০ হইয়াছিল।

২৬। গএ সে ভাবুজ্জোএ দব্বুজ্জোঅং করিস্‌সামো। কল্পসূত্র—১২৮

ইহা ব্যতীত আরও বহু ব্যক্তি তাঁহার ধর্মে শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছিলেন, কিন্তু ব্রতধারণ না করায় তাঁহাদের সংখ্যা লিখিত হয় নাই।

গণধর ও প্রধান আচার্য সম্প্রদায়

মহাবীরের একাদশ জন গণধর ছিলেন তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহাদের ও পরবর্তী প্রধান আচার্য-গণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

১। **ইন্দ্রভূতি গৌতম**—মগধদেশের অন্তর্গত গুব্বর গ্রামের অধিবাসী। পিতার নাম বসুভূতি। গৌতম গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। ৫০ বৎসর বয়সে শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করেন, ৩০ বৎসর পর্যন্ত সংযম পালন করিয়া ৮০ বৎসর বয়সে যে রাত্রিতে মহাবীর নির্বাণ লাভ করেন সেই রাত্রি-প্রভাতে কেবল-জ্ঞান প্রাপ্ত হন; তৎপরে ১২ বৎসর ধর্ম প্রচার করিয়া ৯২ বৎসর বয়সে নির্বাণ লাভ করেন।

২। **অগ্নিভূতি গৌতম**—ইন্দ্রভূতির সহোদর দ্বিতীয় ভ্রাতা। ৪৬ বৎসর বয়সে শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করেন। দ্বাদশ-বর্ষ পরে কেবল-জ্ঞান প্রাপ্ত হন ও তাহার ষোড়শ বৎসর পরে মহাবীরের জীবদ্দশাতেই ৭৪ বৎসর বয়সে নির্বাণ প্রাপ্ত হন।

৩। **বায়ুভূতি গৌতম**—ইন্দ্রভূতির তৃতীয় সহোদর। ৪২ বৎসর বয়সে শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করেন, দশ বৎসর পরে কেবল-জ্ঞান প্রাপ্ত হন এবং তৎপরে ১৮ বৎসর পরে মহাবীরের জীবদ্দশাতেই ৭০ বৎসর বয়সে মুক্তি লাভ করেন।

৪। **আর্য ব্যক্ত**—ইনি কোল্লাগ সন্নিবেশ নিবাসী ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ধনমিত্রের পুত্র। পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রমে নির্গ্রন্থ দীক্ষা গ্রহণ করেন, দ্বাদশ বৎসর পরে

কেবল-জ্ঞান প্রাপ্ত হন ও তাহার ১৮ বৎসর পরে মহাবীরের জীবদ্দশাতেই ৮০ বৎসর বয়সে মুক্তি প্রাপ্ত হন।

৫। **সুধর্ম**—কোল্লাগ সন্নিবেশবাসী অগ্নিবৈশ্যায়ন গোত্রীয় ধম্মিল নামক ব্রাহ্মণের পুত্র। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে নির্গ্রন্থ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ৯২ বৎসর বয়ঃক্রমে কেবল-জ্ঞান প্রাপ্ত ও তাহার ৮ বৎসর পরে একশত বৎসর বয়সে মহাবীরের নির্বাণের ২০ বৎসর পরে মুক্তি প্রাপ্ত হন। ইঁহার আয়ু সর্বাপেক্ষা অধিক জানিয়া মহাবীরের পরে ইঁহাকে নির্গ্রন্থ সংঘের নেতৃত্ব প্রদান করা হয়। ইঁহার শিষ্য পরম্পরা এখন পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। বর্তমানে প্রচলিত সমস্ত অঙ্গশাস্ত্র[২৭] ইঁহার রচিত। জৈনশাস্ত্রে লিখিত আছে যে ভগবান্ মহাবীরের উপদিষ্ট **"উপ্পজ্জেই বা বিগমেই বা ধুবেই বা"**[২৮] এই ত্রিপদীকে অবলম্বন করিয়া গণধরগণ দ্বাদশ অঙ্গশাস্ত্রের রচনা করেন।

৬। **মণ্ডিত**—মৌর্যসন্নিবেশের অধিবাসী বশিষ্ঠ গোত্রীয় ধনদেবের পুত্র। ৫৩ বৎসর বয়সে দীক্ষা গ্রহণ করেন, ৬৭ বৎসর বয়সে কেবল-জ্ঞান প্রাপ্ত হন ও ৮৩ বৎসর বয়সে মোক্ষপ্রাপ্ত হন।

২৭। অঙ্গশাস্ত্র দ্বাদশটি। দ্বাদশতম অঙ্গের মধ্যে চতুর্দশটি পূর্ব শাস্ত্র অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাহা এখন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন একাদশটি অঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

২৮। এই ত্রিপদীর অর্থ—উৎপন্ন হয়, বিনাশপ্রাপ্ত হয় ও ধ্রুব বা স্থির থাকে। জৈন দর্শন মতে প্রত্যেক সৎ-পদার্থের মধ্যে প্রতি সময়ে যুগপৎ উৎপত্তি, বিনাশ ও স্থিতির ক্রিয়া চলিতেছে। ইহাই জৈন দর্শনের সার।

৭। **মৌর্যপুত্র**—মৌর্যসন্নিবেশের অধিবাসী কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌর্যনামক ব্রাহ্মণের পুত্র। ৬৫ বৎসর বয়সে দীক্ষাগ্রহণ করেন, ৭৯ বৎসর বয়সে কেবল-জ্ঞান প্রাপ্ত হন ও ৯৫ বৎসর বয়ঃক্রমে নির্বাণলাভ করেন।

৮। **অকম্পিত**—ইনি মিথিলার গৌতম গোত্রীয় দেব নামক ব্রাহ্মণের পুত্র। ৪৮ বৎসর বয়সে শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করেন, ৯ বৎসর পরে কেবল-জ্ঞান ও ৭৮ বৎসর বয়ঃক্রমে নির্বাণ প্রাপ্ত হন।

৯। **অচলভ্রাতা**—কোশল নিবাসী হারীত গোত্রীয় বসু নামক ব্রাহ্মণের পুত্র। ৪৬ বৎসর বয়সে শ্রমণ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, দ্বাদশবর্ষ পরে কেবল-জ্ঞান ও তাহার চতুর্দশ বৎসর পরে নির্বাণপ্রাপ্ত হন।

১০। **মেতার্য**—বৎস দেশের অন্তর্গত তুঙ্গীক সন্নিবেশের কৌডিন্য গোত্রীয় দত্ত নামক ব্রাহ্মণের পুত্র। ৩৬ বৎসর বয়সে শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করেন, দশ বৎসর পরে কেবল-জ্ঞান ও তাহার ষোড়শ বৎসর পরে নির্বাণলাভ করেন।

১১। **প্রভাস**—রাজগৃহ নিবাসী কৌডিন্য গোত্রীয় বল নামক ব্রাহ্মণের পুত্র। ষোড়শ বৎসর বয়সে দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাহার আট বৎসর পরে কেবল-জ্ঞান ও তাহার ষোড়শ বৎসর পরে ৪০ বৎসর বয়সে নির্বাণ প্রাপ্ত হন।

এই একাদশজন গণধরের মধ্যে প্রথম ইন্দ্রভূতি গৌতম ও পঞ্চম সুধর্ম ব্যতীত অন্য সকলে মহাবীরের জীবদ্দশাতেই মুক্তিলাভ করেন। ভগবান্ মহাবীরের নির্বাণের পর পঞ্চম গণধর **সুধর্মস্বামী** সমস্ত নির্গ্রন্থ সংঘের নেতা হইলেন। ইনি ২০ বৎসর নেতৃত্ব করিয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হন। তৎপরে ইঁহার প্রধান শিষ্য **আর্য জম্বুস্বামী** সংঘের নেতা হইলেন। আর্য জম্বু ষোড়শ

বৎসর বয়সে শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাহার বিংশতি বর্ষ পরে কেবল-জ্ঞান প্রাপ্ত হন ও তৎপরে ৪৪ বৎসর সংঘের নেতৃত্ব ও ধর্মপ্রচার করিয়া ৮০ বৎসর বয়সে মুক্তি-লাভ করেন। ইঁহার পরে আর কোন আচার্য মুক্তিপ্রাপ্ত হন নাই। আর্য জম্বুর নির্বাণের পর তাঁহার শিষ্য **আর্য প্রভব** সংঘের নেতা হইলেন। ইনি ১১ বৎসর নেতৃত্ব করিয়া দেহরক্ষা করিলে তাঁহার শিষ্য **আর্য শয্যম্ভব** ২৩ বৎসর পর্যন্ত সংঘের নেতৃত্ব করেন। তিনি পরলোকগত হইলে তাঁহার শিষ্য **আর্য যশোভদ্র** ৫০ বৎসর যাবৎ নেতৃত্ব করিয়া গতাসু হন ও তৎপরে তাঁহার শিষ্য **আর্য সম্ভূত বিজয়** ৮ বৎসর যাবৎ ও তৎপরে আর্য যশোভদ্রের অন্যতর শিষ্য **আর্য ভদ্রবাহু** সংঘের নেতা হন। ভদ্রবাহু শেষ শ্রুত-কেবলী[২৯]। ইনি চতুর্দশ বৎসর সংঘের নেতৃত্ব করিয়া মহাবীর নির্বাণের ১৭০ বৎসর পরে পরলোকগত হন। আর্য ভদ্রবাহুর পরবর্তী আচার্যগণের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক বলিয়া এস্থলে পরিত্যক্ত হইল।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে ভগবান্ মহাবীরের প্রচারিত ধর্ম পালন করিয়া তাঁহার জীবদ্দশাতেই বহু ব্যক্তি সাধনার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়া তাঁহারই ন্যায় কেবল-জ্ঞান প্রাপ্ত হন ও আত্মার পূর্ণতম বিকাশ

২৯। যিনি চতুর্দশ পূর্ব শাস্ত্র সহিত সমগ্র দ্বাদশটি অঙ্গশাস্ত্র, মূল ও অর্থসহিত অবগত থাকেন তাঁহাকে শ্রুত-কেবলী বলে। ইঁহারা কেবল-জ্ঞান সম্পন্ন নহেন কিন্তু সমগ্র শ্রুত শাস্ত্রের জ্ঞান থাকায় কেবল—জ্ঞানীর ন্যায় বস্তুতত্ত্ব প্রকাশ করিতে পারেন বলিয়া ইঁহা-দিগকে শ্রুত-কেবলী বলা হয়। আর্য প্রভব হইতে ভদ্রবাহু পর্যন্ত পাঁচজন আচার্য শ্রুত-কেবলী, তৎপরে পূর্ব শাস্ত্রের জ্ঞান ক্রমে বিলুপ্ত হইতে লাগিল।

করিয়া মোক্ষ লাভ করেন। তাঁহার নির্বাণের পর তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য দুইজন—ইন্দ্রভূতি গৌতম ও সুধর্ম—এবং প্রশিষ্য একজন—জম্বু—তাঁহারই ন্যায় কেবল-জ্ঞান ও নির্বাণ প্রাপ্ত হন। এরূপ ঘটনা সচরাচর দুর্লভ।

জৈন ধর্ম

ভগবান মহাবীর যে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন সেই ধর্মের প্রধান লক্ষ্য আত্মার বিকাশ করিয়া মুক্ত হওয়া। কিন্তু আত্মা কি, তাহার গুণ কি, কি প্রকারে আত্মা সংসারে পরিভ্রমণ করিয়া দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং কি কি উপায়ে এই সংসার ভ্রমণ হইতে মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে—এই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান না হইলে আত্মার বিকাশ সাধন করা সম্ভব নয়। এই সমস্ত বিষয় জানিতে হইলে বিশ্ব-সংসার কি কি পদার্থ দিয়া নির্মিত, তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ কি, কি কারণে ও কি ভাবে আত্মা বদ্ধ হয় ও কি উপায়ে সেই বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় প্রভৃতি তত্ত্বের জ্ঞান থাকাও আবশ্যক। এই জন্য জৈন শাস্ত্রে নয়টি তত্ত্ব স্বীকার করা হইয়াছে, ইহাদেরকে নবতত্ত্ব বলে। যথাঃ **জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, পুণ্য, পাপ, সংবর, নির্জরা ও মোক্ষ**। জীব ও অজীব এই দুইটি তত্ত্বের মধ্যেই বিশ্বের সমস্ত পদার্থ সমাবিষ্ট হইয়া যায়। অন্য সাতটি তত্ত্বে জীব বা চেতন আত্মা কিরূপে অজীব বা জড় দ্রব্যের দ্বারা আবদ্ধ হয়, সেই বন্ধনগুলি কি প্রকারের এবং কি উপায়ে সেই সকল বন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়া যায় তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

জীব

প্রথম তত্ত্ব—জীব। জীবের লক্ষণ চৈতন্য, অর্থাৎ যাহার চেতনা আছে তাহাকে **জীব** বলে। জ্ঞান, দর্শন,

বীর্য, আনন্দ প্রভৃতিও জীবের লক্ষণ। প্রত্যেক জীবের পৃথক সত্তা আছে এবং জীব সংখ্যায় অনন্ত। জীব দুই প্রকার সংসারী ও মুক্ত। যাঁহারা সম্পূর্ণ কর্ম ক্ষয় করিয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে **মুক্ত** বা **সিদ্ধ** জীব বলে—মুক্ত আত্মাও বলা হয়। ইঁহারা অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দর্শন, অনন্ত বীর্য ও অনন্ত আনন্দময় এবং আর কখনও সংসারে পুনরাবর্তন করেন না। এইরূপ মুক্তি লাভ করাই প্রত্যেক সংসারী জীবের চরম ও পরম লক্ষ্য। জীবকে জীবাস্তিকায় বলে।

যাহারা সংসারে জন্ম ও মরণ প্রাপ্ত হইতেছে এবং এখনও মুক্ত হয় নাই তাহাদিগকে **সংসারী জীব** বলে। ইহারা দেব, মানব, নারক ও তির্যক[৩০] এই চারি প্রকার যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে ও আয়ুক্ষয়ে মরণ প্রাপ্ত হইয়া আবার জন্ম গ্রহণ করে। যে পর্যন্ত মুক্তি প্রাপ্ত না হয় সে পর্যন্ত এইভাবে জন্ম, জরা ও মরণের দুঃখ ও বেদনা সহ্য করিতে হয়। সংসারী জীবকে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা অনুসারে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথাঃ—একেন্দ্রিয়, দ্বীন্দ্রিয়, ত্রীন্দ্রিয়, চতুরিন্দ্রিয় ও পঞ্চেন্দ্রিয়। যাহাদের কেবল মাত্র স্পর্শেন্দ্রিয় আছে অন্য কোন ইন্দ্রিয় নাই তাহাদিগকে **একেন্দ্রিয়** জীব বলে। ইহারা চলন শক্তি হীন বলিয়া ইহাদিগকে **স্থাবর**ও বলা হয়। স্থাবর জীব আবার পাঁচভাগে বিভক্তঃ—(ক) **পৃথ্বীকায়** অর্থাৎ মৃত্তিকা, প্রস্তর, ধাতু প্রভৃতি, (খ) **অপ্‌কায়** অর্থাৎ জল, শিশির, শিল প্রভৃতি, (গ) অগ্নিকায় অর্থাৎ অগ্নি, অঙ্গার প্রভৃতি, (ঘ) **বায়ুকায়** অর্থাৎ বাতাস, বাত্যা, ঘূর্ণবাত প্রভৃতি, (ঙ)

৩০। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি প্রাণী তির্যক্ পর্যায় ভুক্ত।

বনস্পতিকায় অর্থাৎ বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতি। মৃত্তিকা, প্রস্তরাদি, সকল প্রকার জল, সকল প্রকার অগ্নি, সকল প্রকার বায়ু, ও সকল প্রকার বৃক্ষাদি স্বাভাবিক অবস্থায় মৃত্তিকা-জল-অগ্নি-বায়ু-বনস্পতি-রূপ শরীরযুক্ত জীব। দ্বি-ইন্দ্রিয় হইতে পঞ্চেন্দ্রিয় পর্যন্ত চারি প্রকার জীবকে **ত্রস** জীব বলে—কারণ ইহারা চলন-শক্তি-সম্পন্ন। অন্য মতে অগ্নিকায় ও বায়ুকায় জীবকে স্থাবর পর্যায়ে না ধরিয়া ত্রস পর্যায়ে ধরা হয় কারণ এই দুই প্রকার জীবও চলন-শক্তি-সম্পন্ন।

দ্বীন্দ্রিয় জীবের স্পর্শেন্দ্রিয় ও রসনেন্দ্রিয় এই দুইটি মাত্র ইন্দ্রিয় আছে; যেমনঃ—কৃমি, জলৌকা প্রভৃতি। **ত্রীন্দ্রিয়** জীবের উক্ত দুই ইন্দ্রিয় সহ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ও থাকে; যথাঃ—পিপীলিকা, উৎকুণ প্রভৃতি। চতুরিন্দ্রিয় জীবের উক্ত তিন ইন্দ্রিয় সহ চক্ষুরিন্দ্রিয়ও থাকে; যথাঃ—মক্ষিকা, ভ্রমর প্রভৃতি। **পঞ্চেন্দ্রিয়** জীবের উপরোক্ত চারিটি ব্যতীত শ্রবণেন্দ্রিয়ও থাকে; যেমন মনুষ্য, পশু, পক্ষী, দেবতা ও নারক জীব। একেন্দ্রিয় হইতে চতুরিন্দ্রিয় জীব **অমনস্ক** অর্থাৎ ইহাদের মন নাই। দেবতা, নারক, মনুষ্য, পশু, পক্ষী আদি পঞ্চেন্দ্রিয় জীব **সমনস্ক** অর্থাৎ ইহাদের মন থাকে। যদিও ইহাদের মনের বিকাশে বহু তারতম্য বিদ্যমান।

জৈন শাস্ত্রমতে নরক সাতটি। মধ্যলোকস্থিত ভূভাগের অভ্যন্তরে, ঊর্ধ্বে ও নিম্নে এক হাজার যোজন করিয়া ছাড়িয়া দিয়া, মধ্যবর্তী বিভাগের স্থানে স্থানে এবং এই পৃথিবী হইতে বহু নীচে একটির পর একটি এরূপ আরও ছয়টী পৃথক্ পৃথক্ পৃথিবীতে এই সমস্ত নরক অবস্থিত। নরক বা নরকাবাসগুলিতে যে সকল জীব এক বিশেষ প্রকার দেহ ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করে সেই সকল

জীবকে নারক বা নারকীয় **জীব** বলে। যাহারা পাপাচরণ করে তাহারা মৃত্যুর পর নরকে গিয়া নারক জীবরূপে উৎপন্ন হয়। তাহারা সেখানে আজীবন ভীষণ যন্ত্রণা ও কষ্ট সহ্য করে। প্রথম নরক হইতে দ্বিতীয়, দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় এইভাবে ক্রমশঃ সপ্তম নরক পর্যন্ত নারক জীবের দুঃখ ও যন্ত্রণা ক্রমে ভীষণ হইতে ভীষণতর হয়।

দেবগণ চারিভাগে বিভক্ত ; যথাঃ—(১) **ভবনপতি**, (২) **ব্যন্তর**, (৩) **জ্যোতিষ্ক**, (৪) **বৈমানিক**। ভবনপতি দেবগণ এই পৃথিবীতে মেরু পর্বতের নিম্নে এবং তাহার উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বাস করেন। অসুরকুমার, নাগকুমার, সুপর্ণকুমার আদি ইহাদের বিভাগ আছে। ব্যন্তরগণ পৃথিবীর ঊর্ধ্বে, নিম্নে এবং সমতলে বাস করেন। ইহাদের কিন্নর, কিংপুরুষ, গন্ধর্ব, যক্ষ, ভূত, পিশাচ আদি বিভাগ আছে। জ্যোতিষ্ক দেবগণ পৃথিবী ছাড়িয়া কেবল মাত্র ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি এই বিভাগের অন্তর্গত। বৈমানিক দেবগণ জ্যোতিষ্কের উপরে বহু ঊর্ধ্বে, দ্বাদশটি স্বর্গে, এবং তাহারও ঊর্ধ্বে নয়টি গ্রৈবেয়ক স্বর্গে ও তাহারও ঊর্ধ্বে পাঁচটি অনুত্তর বিমান নামক স্বর্গে বাস করেন। এই সমস্ত দেবগণ অসাধারণ শক্তিশালী এবং দীর্ঘায়ু। ইঁহাদের আয়ু এত অধিক দীর্ঘ যে ইঁহাদিগকে অমর বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনও দেবই অমর নহেন, প্রত্যেকেই মরণশীল। প্রথম স্বর্গ হইতে দ্বিতীয়ে, দ্বিতীয় হইতে তৃতীয়ে, এরূপে ক্রমশঃ দেবগণের আয়ু, বল, সুখ, প্রভাব, দ্যুতি প্রভৃতি উত্তরোত্তর অধিকাধিক।

অজীব

দ্বিতীয় তত্ত্ব—অজীব। জীবের যে সমস্ত লক্ষণ দেওয়া

হইয়াছে অজীব তাহার বিপরীত লক্ষণ-যুক্ত, অর্থাৎ চেতনা শূন্য—জড়। অজীব বা জড় পাঁচ প্রকার ; যথাঃ—**ধর্মাস্তিকায়, অধর্মাস্তিকায়, আকাশাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায়** ও **কাল**। এই পাঁচটি দ্রব্যই নিত্য।

ধর্মাস্তিকায় এমন একটি দ্রব্য যাহা জীব ও পুদ্গলের গতিতে সহায়তা করে, অর্থাৎ এই দ্রব্য না থাকিলে জীব বা জড় পদার্থের পক্ষে কোন প্রকার গতি করা সম্ভব হইত না। এইজন্য ইহাকে গতিসহায়ক বলে। ইহা অরূপী, অচেতন ও সম্পূর্ণ লোক[৩১] ব্যাপিয়া অবস্থিত।

অধর্মাস্তিকায় এমন একটি দ্রব্য যাহা জীব ও জড় পদার্থকে যদি তাহারা গতিরোধ করিতে উদ্যত হয়, তবে গতিরোধ করিয়া স্থির হইতে সহায়তা করে। এই কারণে ইহাকে স্থিতিসহায়ক বলে। ইহাও অরূপী, অচেতন ও সম্পূর্ণ লোক ব্যাপিয়া অবস্থিত।

আকাশাস্তিকায় জীব, পুদ্গল প্রভৃতি অন্যান্য সমস্ত পদার্থকে অবকাশ অর্থাৎ অবস্থিতির স্থান দান করে। ইহা সম্পূর্ণ লোক ও অলোক ব্যাপিয়া অবস্থিত, এবং অরূপী ও অচেতন।

পরমাণু এবং পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন সর্বপ্রকার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পদার্থ সমূহকে **পুদ্গলাস্তিকায়** বলে।

৩১। বিশ্বের যে অংশে জীব ও জড় পদার্থ আছে, যাহার মধ্যে নানা প্রকার প্রাণী ও বিশ্বরচনার বৈচিত্র্য বিদ্যমান, সেই অংশকে লোক বলে আর এই লোকের চতুর্দিকে যে অনন্ত শূন্য বিদ্যমান তাহাকে অলোক বলা হয়। অলোকে আকাশ ব্যতীত অন্য দ্রব্য নাই, এবং ধর্মাস্তিকায় ও অধর্মাস্তিকায় না থাকায় সেখানে কোন জীব বা জড় পদার্থ গমনাগমন করিতে পারে না।

জড় পদার্থের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র অবিভাজ্য অংশকে পরমাণু বলে। সম্পূর্ণ জড় জগৎ পরমাণু ও পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন পদার্থের দ্বারা নির্মিত। পুদ্গল দ্রব্য সকল সংখ্যায় অনন্ত। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ প্রভৃতি পুদ্গল দ্রব্যের লক্ষণ। পরমাণু যদিও আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয়, তথাপি ইহাতে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ আছে।

জীবাস্তিকায়, ধর্মাস্তিকায়, অধর্মাস্তিকায়, আকাশাস্তিকায় ও পুদ্গলাস্তিকায়—এই পাঁচটি দ্রব্যের সহিত অস্তিকায় শব্দটি যে প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহার একটি বিশেষ অর্থ আছে। অস্তি শব্দের অর্থ—প্রদেশ। কোনও দ্রব্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবিভাজ্য অংশকে প্রদেশ বলে। এরূপ অবিভাজ্য প্রদেশের সমবায় বা সমূহকে কায় বলে। অতএব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবিভাজ্য প্রদেশ সমূহের প্রচয়ে নির্মিত দ্রব্যকে অস্তিকায় বলে। জীব, ধর্ম, অধর্ম, আকাশ ও পুদ্গল এই পাঁচটি দ্রব্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও অবিভাজ্য প্রদেশ সমূহের সমবায়ে নির্মিত বলিয়া ইহারা প্রত্যেকে অস্তিকায়।

কাল কল্পিত পদার্থ, ইহার বাস্তব সত্তা নাই। ইহা চন্দ্র, সূর্য ও তারকাদির গতির দ্বারা কল্পিতভাবে নিরূপিত হয়। বর্তমান কালের সূক্ষ্মতম অংশকে **সময়** বলে। জৈন দর্শনে সময় শব্দের এরূপ বিশেষ অর্থে ব্যবহার আছে। অতীত কাল বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, ভবিষ্যৎ কালের বর্তমানে কোন সত্তা নাই, তজ্জন্য মাত্র বর্তমান সময় পরিমিত, অর্থাৎ ইহার একটি মাত্রই প্রদেশ, —প্রদেশের সমবায় নাই, তজ্জন্য ইহাকে অস্তিকায়ের মধ্যে গণনা করা হয় নাই। এইরূপ সূক্ষ্মতম সময়ের কল্পিত সমূহকে আবলিকা, মুহূর্ত, দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, বৎসরাদি রূপে বর্ণনা করা হইয়া থাকে। অন্য মতে

কালেরও সত্তা আছে, ইহা কল্পিত পদার্থ মাত্র নয়। ইহা অণু-পরিমিত ও ইহাকে কালাণু বলা হয়। প্রত্যেক কালাণু পৃথক ভাবে এক একটি আকাশ-প্রদেশে অবস্থিত বলিয়া ইহাকে অস্তিকায় বলা হয় নাই। ইহা জীব ও পুদ্গলের অবস্থান্তর প্রাপ্তিতে নিমিত্ত রূপে প্রবর্তিত হয়। ইহাও অরূপী ও অচেতন।

এপর্যন্ত জীব ও অজীব অর্থাৎ যে দুইটি তত্ত্বের দ্বারা বিশ্ব সংসার নির্মিত, তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল। এখন জীব কি প্রকারে কর্মের দ্বারা বদ্ধ হইয়া সংসারে পরিভ্রমণ করে এবং কি উপায়ে মুক্ত হইতে পারে তাহা বাকি সাতটি তত্ত্বের বিবরণে বলা হইতেছে।

আস্রব

তৃতীয় তত্ত্বের নাম—আস্রব। যে যে কারণের দ্বারা আত্মার সহিত বন্ধনের জন্য শুভাশুভ কর্মের আগমন হয়, তাহাকে **আস্রব** বলে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, বিষয়ের প্রতি প্রবৃত্তিকে আস্রব বলে। মিথ্যাত্ব (অবিদ্যা), অবিরতি (অসংযম), কষায় (ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ), প্রমাদ (অনবধানতা) ও যোগ (মন, বচন ও কায়ার ব্যাপার) মোটামুটি এই পাঁচটি কারণের দ্বারা শুভাশুভ কর্মের আগমন হয় এবং তজ্জন্য ইহারা আস্রব। হিংসা, অসত্য, চৌর্য, মৈথুন, পরিগ্রহ বা বিষয়ের প্রতি আসক্তি প্রভৃতি কর্ম বন্ধনের হেতু এবং তজ্জন্য ইহারাও আস্রব।

বন্ধ

চতুর্থ তত্ত্বের নাম—বন্ধ। আত্মার সহিত কর্ম বর্গণার

অনন্তানন্ত পরমাণুর দ্বারা গঠিত স্কন্ধের[৩২] বন্ধনকে **বন্ধ** বলে। বর্গণা শব্দের অর্থ প্রকার। এক বিশেষ প্রকারের পরমাণু আছে যাহা জীবের মিথ্যাত্ব, মন-বচন-কায়ার যোগ ও রাগ দ্বেষ প্রভৃতি অধ্যবসায়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আত্মার সহিত বন্ধ হয়। এরূপ পরমাণুকে কর্ম বর্গণার পরমাণু বলে। আত্মার মূল স্বরূপ শুদ্ধ, নির্মল, চৈতন্যময়, অরূপী—ইহার সহিত রূপী, অচেতন পরমাণুর বন্ধন হইতে পারে না, কিন্তু অনাদি কাল হইতে মূর্ত কর্ম পুদ্গলের সহিত বন্ধ থাকাতে আত্মা আবরণ-ময় হইয়া আছে। এই কর্মের আবরণকে জৈন পরিভাষায় **কার্মণ শরীর** বলে। অন্য দর্শনে ইহাকেই লিঙ্গ শরীর বলে। জীব অনাদি কাল হইতে কার্মণ শরীর যুক্ত রহিয়াছে এবং তজ্জন্য তাহাতে নানা প্রকার অধ্যবসায় ও প্রবৃত্তির উদয় হয়। এই সমস্ত অধ্যবসায় ও প্রবৃত্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নবীন কর্মপুদ্গল ক্রমাগত সেই কার্মণ শরীরের সহিত বন্ধ হইতেছে এবং সেই সমস্ত বন্ধ কর্মের প্রভাবে জীবকে নানা প্রকার সুখ দুঃখ ভোগ করিতে করিতে সংসার চক্রে পরিভ্রমণ করিতে হইতেছে।

কর্ম পুদ্গল জীবাত্মার সহিত বন্ধ হইবার সময় চারি প্রকারে বন্ধ হয়ঃ—**প্রকৃতিবন্ধ, স্থিতিবন্ধ, অনুভাব-বন্ধ,** ও **প্রদেশবন্ধ**।

কর্ম পুদ্গল জীবাত্মার সহিত বন্ধ হইবার সময়

৩২। দুই বা ততোধিক পরমাণু সমূহের সংযোগে নির্মিত জড় পদার্থকে স্কন্ধ বলে। ইহা একটি জৈন পারিভাষিক শব্দ।

জীবের মন-বচন-কায়ার যোগের শুভাশুভতা তীব্রতা বা মন্দতা প্রভৃতি কারণের দ্বারা বিশেষ বিশেষ প্রকারের পরিণতি ও আত্মার বিশেষ বিশেষ গুণকে আবৃত করিবার স্বভাব লইয়া বন্ধ হয়। এই রূপ বন্ধকে **প্রকৃতি বন্ধ** বলে। জীবের কায়িক, বাচনিক ও মানসিক যোগ-শক্তির বিভিন্নতার জন্য প্রকৃতি বন্ধ অসংখ্য প্রকারের হয়। কিন্তু সংক্ষেপে বর্গীকরণ করিয়া তৎসমস্তকে প্রধান আট ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথাঃ—১। জ্ঞানাবরণীয়, ২। **দর্শনাবরণীয়**, ৩। **বেদনীয়**, ৪। **মোহনীয়**, ৫। **আয়ু**, ৬। **নাম**, ৭। **গোত্র**, ৮। **অন্তরায়**।

জ্ঞানাবরণীয় কর্ম আত্মার জ্ঞান শক্তিকে আবৃত করে। **দর্শনাবরণীয়** কর্ম সামান্য বোধ রূপ দর্শন শক্তিকে আবৃত করে। যাহা আত্মার অবাধ ও অনন্ত সুখকে আবৃত করে এবং যাহার প্রভাবে সাংসারিক সুখ ও দুঃখের অনুভূতি হয় তাহাকে **বেদনীয়** কর্ম বলে। যাহা আত্মার নিজ স্বভাবের প্রতি ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব করিয়া পর বস্তুতে অহংভাব বা মোহ উৎপন্ন করে তাহাকে **মোহনীয়** কর্ম, যে কর্মের প্রভাবে আত্মার নিজ স্বরূপে অক্ষয় স্থিতিরূপ স্বভাবকে আবৃত করিয়া জীবকে নির্দিষ্ট কালের জন্য প্রত্যেক জন্মে তৎ তৎ শরীরে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিতে বাধ্য করে তাহাকে **আয়ু** কর্ম, যে কর্মের প্রভাবে আত্মার অরূপিত্বগুণকে আবৃত করিয়া রূপ গ্রহণ করিতে বাধ্য করে ও যাহার প্রভাবে জীব পূর্ণ বা বিকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি, যশ বা অপযশ ইত্যাদি বহু বিচিত্রতা প্রাপ্ত হয় তাহাকে **নাম** কর্ম, যে কর্মের প্রভাবে আত্মার অগুরুলঘু গুণ আবৃত হইয়া উচ্চ বা নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য করে তাহাকে **গোত্র** কর্ম; এবং যাহা আত্মার বীর্যগুণকে আবৃত করিয়া জীবকে দানাদি প্রদান

করিতে বা স্বয়ং ভোগ করিতে বাধা প্রদান করে তাহাকে **অন্তরায়** কর্ম বলে। প্রকৃতি বন্ধের এই মূল আটটি ভাগের আবার প্রত্যেকের বহু উপবিভাগ আছে তাহা এ স্থলে উল্লেখ করা হইল না।

কর্ম পুদ্গল বন্ধ হইবার সময় রাগ, দ্বেষ প্রভৃতির তীব্রতা বা মন্দতার জন্য বিস্তৃত বা অল্প সময়ের স্থিতি লইয়া বন্ধ হয়, ইহাকে **স্থিতি-বন্ধ** বলে।

রাগ-দ্বেষাদি অধ্যবসায়ের তারতম্যের প্রভাবে কর্ম পুদ্গল শুভ কি অশুভ, তীব্র কি মন্দ, ইত্যাদি কিরূপ ফল প্রদান করিবে তাহা তাহার বন্ধের সময় নিশ্চিত হয়। এরূপ ফল প্রদান করিবার শক্তিরূপ রসযুক্ত হইয়া যে বন্ধ হয় তাহাকে **অনুভাব বন্ধ** বা **রসবন্ধ** বলে।

মন-বচন-কায়ার যোগের প্রভাবে যখন কর্ম পুদ্গল জীবের সহিত বন্ধ হইবার জন্য আকৃষ্ট হইয়া আসে তখন তাহা যোগের তারতম্যের জন্য কখনও অধিক বা কখনও অল্প সংখ্যায় আগত হইয়া আত্মার সহিত বন্ধ হয়। এই-রূপ অল্প বা বহু পরিমাণ বিশিষ্ট বন্ধকে **প্রদেশ বন্ধ** বলে।

পুণ্য

পঞ্চম তত্ত্ব—পুণ্য। মন, বাক্য ও শরীরের শুভ ব্যাপার ও শুভ পরিণামের দ্বারা শুভ বা সুখদায়ক ফল প্রদান করিবার রস লইয়া যে কর্মের বন্ধ হয় তাহাকে **পুণ্য** বলে। অন্ন, জল, স্থান, শয্যা, বস্ত্রাদি দানের দ্বারা, শুভ সংকল্পের দ্বারা এবং দেব, গুরুর পূজা বন্দনাদির দ্বারা শুভ কর্মের বন্ধ হয়। পুণ্য কর্মের ফল স্বরূপ শারীরিক ও মানসিক সুখ, নীরোগ ও সুন্দর শরীর, ধন সম্পত্তি ও যশাদির প্রাপ্তি প্রভৃতি শুভ ফল পাওয়া যায়।

পাপ

ষষ্ঠ তত্ত্ব—পাপ। পুণ্যের বিপরীত তত্ত্বকে পাপ বলে। মন, বচন ও কায়ার অশুভ ব্যাপার ও অশুভ অধ্যবসায়ের দ্বারা অশুভ বা দুঃখদায়ক ফল প্রদান করিবার রস লইয়া যে কর্মের বন্ধ হয় তাহাকে **পাপ** বলে। জীবহিংসা, মিথ্যা-কথন, চৌর্য, অব্রহ্মচর্য, ভোগোপভোগের বস্তুর প্রতি আসক্তি, ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ প্রভৃতি অশুভ প্রবৃত্তির দ্বারা পাপ কর্মের বন্ধ হয়। পাপ কর্মের ফলস্বরূপ নানা প্রকার রোগ, অশোভন শরীর, তির্যক যোনিতে অর্থাৎ পশু, পক্ষী, কীটাদি যোনিতে বা নরকে উৎপত্তি এবং দারিদ্র্য প্রভৃতি নানা প্রকার কষ্ট ভোগ হয়। পাপকর্ম যুক্ত আত্মা বিকাশের দিকে অগ্রসর না হইয়া বরং অধিকাধিক কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সংসারে অনন্ত কাল পর্যন্ত ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়। পুণ্য ও পাপ এই দুইটি তত্ত্ব বন্ধ তত্ত্বেরই প্রকার ভেদমাত্র, তজ্জন্য কোন কোন গ্রন্থকার পুণ্য ও পাপকে বন্ধের অন্তর্ভুক্ত ধরিয়া সর্বসমেত সাতটি তত্ত্ব গণনা করেন।

সংবর

সপ্তম তত্ত্ব—সংবর। যে সমস্ত কার্যের দ্বারা কর্মের আস্রব অর্থাৎ আগমনকে নিরোধ করা যায় তাহাকে **সংবর** বলে। ইহা আস্রবের বিপরীত তত্ত্ব। মন, বচন ও কায়ার সংযম, শুভধ্যান, ইচ্ছার নিরোধ, ক্ষমা, কোমলতা, শৌচ, সত্য, সংযম, তপস্যা, ত্যাগ, নির্মমত্ব, ব্রহ্মচর্য, অশুভ প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তি, নির্লোভতা প্রভৃতি সদ্গুণের চিন্তন ও পালন করা, সংসারের অনিত্যতা, শরীরের অশুচিত্ব, কর্মের ফল জীবকে একাকীই ভোগ করিতে হইবে এইরূপ একত্ব ভাবনাদির দ্বারা সংবর সাধিত হয়।

নির্জরা

অষ্টম তত্ত্ব—নির্জরা। পূর্ববন্ধ কর্মকে আত্মা হইতে পৃথক্ করাকে **নির্জরা** বলে। ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে বন্ধ কর্ম যথাসময়ে উদয়ে আসিয়া ফল প্রদান করিয়া ক্ষরিত বা নির্জরিত হইয়া যায়; কিন্তু সঞ্চিত কর্মকে ফল প্রদানে উন্মুখ হইবার পূর্বেই ক্ষয় করিতে না পারিলে মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর, কারণ ফল প্রদান কালে আবার নূতন কর্মের বন্ধ হইতে থাকে; তজ্জন্য মুক্তির অভিমুখে গমনকারী জীবের পক্ষে প্রশস্ত ধ্যানাদির দ্বারা কর্মক্ষয় করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। এইভাবে কর্ম ক্ষয় করাকে নির্জরা কহে। তপস্যার দ্বারা নির্জরা সাধিত হয়। তপস্যা দ্বিবিধঃ—বাহ্য ও আভ্যন্তর। উপবাস, অল্পাহার, ইচ্ছা-নিরোধ, রসত্যাগ[৩৩], কায়ক্লেশ, এবং শরীর সঙ্কুচিত করিয়া নির্জন স্থানে উপবেশন করা, এই ছয়টি **বাহ্যতপ।** প্রায়শ্চিত্ত, বিনয়, বৈয়াবৃত্ত (পীড়িত ও আর্তগণের সেবা শুশ্রূষা করা), স্বাধ্যায়, ব্যুৎসর্গ (শরীরের প্রতি মমত্ব পরিত্যাগ) ও ধ্যান এই ছয়টি **আভ্যন্তর তপস্যা।**

মোক্ষ

নবম বা শেষ তত্ত্ব—মোক্ষ। সমস্ত কর্ম ক্ষয় করিয়া জীবাত্মার নিজ স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়াকে **মোক্ষ** বা **মুক্তি** কহে। সমস্ত কর্ম ক্ষয় করিয়া আবরণ শূন্য হইলে আত্মা অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দর্শন, অনন্ত বীর্য, অনন্ত আনন্দ, অনন্ত জ্যোতিঃ প্রভৃতি অনন্ত গুণময় হইয়া ঊর্ধ্বগতির

৩৩। ঘৃত, তৈল, দুগ্ধ, দধি, গুড় ও ভর্জিত খাদ্য এই পাঁচটিকে বিকৃত রস এবং মদ্য, মাংস, মাখন ও মধু এই চারিটিকে মহাবিকৃত রস কহে।

দ্বারা লোকের শীর্ষভাগে স্থিত হয় ও তথায় অনন্ত কাল ধরিয়া স্বরূপে রমণ করে, আর কখনও জন্ম-জরা-মরণ রূপ সংসার-চক্রে পুনরাবর্তন করে না। আত্মার স্বাভাবিক গতিই ঊর্ধ্বগতি। কর্মাবরণ শূন্য হইলে আত্মা এই ঊর্ধ্ব-গতির দ্বারা ঊর্ধ্বে যাইয়া লোকের শীর্ষভাগে অর্থাৎ যে পর্যন্ত ধর্মাস্তিকায় ও অধর্মাস্তিকায় আছে সেই শেষ সীমা পর্যন্ত যাইয়া স্থিত হয়। আত্মার এই অবস্থা **মুক্ত** বা **সিদ্ধ** অবস্থা; ইহাই **নির্বাণ।** যেমন কোন গৃহে একটি প্রদীপ জ্বালাইলে সমগ্র গৃহ ব্যাপিয়া সেই আলোক অবস্থান করে এবং সেই গৃহে আরও প্রদীপ জ্বালাইলে সেই সমস্ত প্রদীপের আলোক পরস্পর মিলিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ জ্যোতিস্বরূপ মুক্ত আত্মা সমূহ লোকাগ্রে পরস্পর মিলিত হইয়া অবস্থান করে। তাহাদের আর কখনও পুনরাবর্তন করিতে হয় না।

কর্ম কাহাকে বলে, কিভাবে তাহা আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট হয়, পরে কিভাবে উদয়ে আসিয়া ফল প্রদান করিয়া প্রত্যেক শরীরধারী জীবের গতি, অগতি, স্থিতি, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি সমস্ত বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে, কিভাবে আবার বন্ধ কর্মের নির্জরা বা আত্মা হইতে বিচ্যুতি হইয়া আত্মা মুক্ত হয় ইত্যাদি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিশ্লেষণ ও বর্ণনা জৈন শাস্ত্রে বিস্তৃতভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ স্থলে অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র প্রদত্ত হইল।

নবতত্ত্বের বর্ণনা অতি সংক্ষেপে করা হইল এবং শেষ তত্ত্ব মুক্তি-তত্ত্বের কথাও বলা হইল। কি উপায়ে মুক্তি সাধন করা যায় তাহা সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে। **সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চারিত্রের** একত্রে আরাধনা করিলে মোক্ষসাধন করা যাইতে পারে। এই তিনটিকে জৈন শাস্ত্রে **ত্রিরত্ন** বলে।

সম্যক্ দর্শন

সম্যক্‌দর্শনকে সম্যক্‌ত্বও বলে। প্রত্যেক তত্ত্বকে যথাযথ রূপে শ্রদ্ধা করাকে অথবা পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ যথাযথ রূপে স্থির করিবার রুচিকে সম্যক্ দর্শন বলে। ইহাকে বিবেকদৃষ্টিও বলা যাইতে পারে। মিথ্যাত্বের দ্বারা অভিভূত হইয়া জীব সাধারণতঃ সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্যরূপে বিশ্বাস করে এবং তাহারই বিপরীত ভাবে সত্যকে সত্য ও মিথ্যাকে মিথ্যারূপে বুঝিতে পারা ও শ্রদ্ধা করাকে **সম্যক্ দর্শন** বা **সম্যক্‌ত্ব** বলে। ঘোর মিথ্যাত্বের দ্বারা অভিভূত জীবের যখন প্রথম সম্যক্‌ত্বের উদয় হয় তখন আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভ হয় এবং সে তখন জ্ঞেয়কে তাত্ত্বিকরূপে জানিবার, হেয়কে পরিত্যাগ করিবার ও উপাদেয়কে স্বীকার করিবার অভিরুচি বা মনোভাব সম্পন্ন হইয়া ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক মার্গে অগ্রসর হইতে থাকে; এই অবস্থাকে সম্যক্ দর্শনের অবস্থা বলে।

সম্যক্ জ্ঞান

প্রত্যেক জীবে কোন না কোন প্রকার জ্ঞান আছে। কিন্তু যতক্ষণ সম্যক্ দর্শন না হয় ততক্ষণ ঐ জ্ঞানকে অসম্যক্ জ্ঞান বা অজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান বলে। সম্যক্ দর্শন হইবার পরই সেই জ্ঞানকে **সম্যক্ জ্ঞান** বলে। কারণ সম্যক্ দর্শনের অভাবে জীব বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ যথাযথ রূপে জানিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় না এবং সে অবস্থায় তাহার জ্ঞানকে সত্য জ্ঞানও বলা যায় না। সম্যক্ দর্শন উৎপন্ন হইবার পরেই তাহার জ্ঞানকে সম্যক্ জ্ঞান বলা যাইতে পারে। জ্ঞান পাঁচ প্রকারঃ—**মতিজ্ঞান, শ্রুতজ্ঞান, অবধিজ্ঞান, মনঃপর্যায় জ্ঞান,** ও **কেবল জ্ঞান**। যে জ্ঞান

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ও মনের শক্তির দ্বারা উৎপন্ন হয় তাহাকে **মতিজ্ঞান** কহে। যাহাতে শব্দ ও অর্থের পর্যালোচনা থাকে এরূপ জ্ঞানকে **শ্রুতজ্ঞান** বলে। শ্রুতজ্ঞানও মতিজ্ঞানের ন্যায় ইন্দ্রিয় ও মনের শক্তির প্রভাবে উৎপন্ন হয় এবং মতিজ্ঞান উৎপন্ন না হইলে সেই বিষয়ের শ্রুতজ্ঞান হইতে পারে না; তবে শ্রুতজ্ঞানের বিষয় মতিজ্ঞান হইতে অধিক ও স্পষ্টতর এবং ইহাতে শব্দ ও অর্থাদির পর্যালোচনা থাকে। অন্যের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া বা গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া যে জ্ঞান হয় তাহা শ্রুতজ্ঞান। যে জ্ঞানের দ্বারা ইন্দ্রিয় ও মনের সহায়তা ব্যতীত এক নির্দিষ্ট সীমার মধ্যস্থিত সমস্ত রূপী-পদার্থকে জানা যায় তাহাকে **অবধি জ্ঞান** বলে। ইহা আত্মিক জ্ঞান। এই জ্ঞান উৎপন্ন হইলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াও একটি বিশিষ্ট সীমার মধ্যে স্থিত সমস্ত রূপী পদার্থকে অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ অরূপী নয় এরূপ পদার্থকে, দেখিতে পাওয়া যায়। যে জ্ঞানের দ্বারা ইন্দ্রিয় ও মনের সহায়তা ব্যতীত বিশিষ্ট ও নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে স্থিত প্রাণিগণের মনোভাবকে জানিতে পারা যায় তাহাকে **মনঃ-পর্যায় জ্ঞান** বলে। ইহাও আত্মিক জ্ঞান। যে জ্ঞানের দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়ের কোনও প্রকার অবলম্বন ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ লোক ও অলোকের, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালের সমস্ত রূপী ও অরূপী পদার্থ সম্পূর্ণ ভাবে গুণ ও পর্যায় সহ জানা যায় তাহাকে **কেবল জ্ঞান** বলে। বলা বাহুল্য ইহাও আত্মিক জ্ঞান। পূর্বে কথিত জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, মোহনীয় ও অন্তরায় এই চারি প্রকার কর্মের আত্যন্তিক ক্ষয় হইলে আত্মার স্বাভাবিক জ্ঞান বা কেবল-জ্ঞান প্রকাশিত হয়। এই অবস্থাকে জীবন্মুক্ত অবস্থা বলে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জীব, অবশিষ্ট

সম্যক্ দর্শন

সম্যক্‌দর্শনকে সম্যক্‌ত্বও বলে। প্রত্যেক তত্ত্বকে যথাযথ রূপে শ্রদ্ধা করাকে অথবা পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ যথাযথ রূপে স্থির করিবার রুচিকে সম্যক্ দর্শন বলে। ইহাকে বিবেকদৃষ্টিও বলা যাইতে পারে। মিথ্যাত্বের দ্বারা অভিভূত হইয়া জীব সাধারণতঃ সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্যরূপে বিশ্বাস করে এবং তাহারই বিপরীত ভাবে সত্যকে সত্য ও মিথ্যাকে মিথ্যারূপে বুঝিতে পারা ও শ্রদ্ধা করাকে **সম্যক্ দর্শন** বা **সম্যক্‌ত্ব** বলে। ঘোর মিথ্যাত্বের দ্বারা অভিভূত জীবের যখন প্রথম সম্যক্‌ত্বের উদয় হয় তখন আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভ হয় এবং সে তখন জ্ঞেয়কে তাত্ত্বিকরূপে জানিবার, হেয়কে পরিত্যাগ করিবার ও উপাদেয়কে স্বীকার করিবার অভিরুচি বা মনোভাব সম্পন্ন হইয়া ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক মার্গে অগ্রসর হইতে থাকে; এই অবস্থাকে সম্যক্ দর্শনের অবস্থা বলে।

সম্যক্ জ্ঞান

প্রত্যেক জীবে কোন না কোন প্রকার জ্ঞান আছে। কিন্তু যতক্ষণ সম্যক্ দর্শন না হয় ততক্ষণ ঐ জ্ঞানকে অসম্যক্ জ্ঞান বা অজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান বলে। সম্যক্ দর্শন হইবার পরই সেই জ্ঞানকে **সম্যক্ জ্ঞান** বলে। কারণ সম্যক্ দর্শনের অভাবে জীব বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ যথাযথ রূপে জানিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় না এবং সে অবস্থায় তাহার জ্ঞানকে সত্য জ্ঞানও বলা যায় না। সম্যক্ দর্শন উৎপন্ন হইবার পরেই তাহার জ্ঞানকে সম্যক্ জ্ঞান বলা যাইতে পারে। জ্ঞান পাঁচ প্রকারঃ—**মতিজ্ঞান, শ্রুতজ্ঞান, অবধিজ্ঞান, মনঃপর্যায় জ্ঞান,** ও **কেবল জ্ঞান।** যে জ্ঞান

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ও মনের শক্তির দ্বারা উৎপন্ন হয় তাহাকে **মতিজ্ঞান** কহে। যাহাতে শব্দ ও অর্থের পর্যালোচনা থাকে এরূপ জ্ঞানকে **শ্রুতজ্ঞান** বলে। শ্রুতজ্ঞানও মতিজ্ঞানের ন্যায় ইন্দ্রিয় ও মনের শক্তির প্রভাবে উৎপন্ন হয় এবং মতিজ্ঞান উৎপন্ন না হইলে সেই বিষয়ের শ্রুতজ্ঞান হইতে পারে না; তবে শ্রুতজ্ঞানের বিষয় মতিজ্ঞান হইতে অধিক ও স্পষ্টতর এবং ইহাতে শব্দ ও অর্থাদির পর্যালোচনা থাকে। অন্যের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া বা গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া যে জ্ঞান হয় তাহা শ্রুতজ্ঞান। যে জ্ঞানের দ্বারা ইন্দ্রিয় ও মনের সহায়তা ব্যতীত এক নির্দিষ্ট সীমার মধ্যস্থিত সমস্ত রূপী-পদার্থকে জানা যায় তাহাকে **অবধি জ্ঞান** বলে। ইহা আত্মিক জ্ঞান। এই জ্ঞান উৎপন্ন হইলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াও একটি বিশিষ্ট সীমার মধ্যে স্থিত সমস্ত রূপী পদার্থকে অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ অরূপী নয় এরূপ পদার্থকে, দেখিতে পাওয়া যায়। যে জ্ঞানের দ্বারা ইন্দ্রিয় ও মনের সহায়তা ব্যতীত বিশিষ্ট ও নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে স্থিত প্রাণিগণের মনোভাবকে জানিতে পারা যায় তাহাকে **মনঃ-পর্যায় জ্ঞান** বলে। ইহাও আত্মিক জ্ঞান। যে জ্ঞানের দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়ের কোনও প্রকার অবলম্বন ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ লোক ও অলোকের, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালের সমস্ত রূপী ও অরূপী পদার্থ সম্পূর্ণ ভাবে গুণ ও পর্যায় সহ জানা যায় তাহাকে **কেবল জ্ঞান** বলে। বলা বাহুল্য ইহাও আত্মিক জ্ঞান। পূর্বে কথিত জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, মোহনীয় ও অন্তরায় এই চারি প্রকার কর্মের আত্যন্তিক ক্ষয় হইলে আত্মার স্বাভাবিক জ্ঞান বা কেবল-জ্ঞান প্রকাশিত হয়। এই অবস্থাকে জীবন্মুক্ত অবস্থা বলে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জীব, অবশিষ্ট

আয়ুক্ষয়ান্তে নিশ্চয়ই মুক্তি বা নির্বাণ প্রাপ্ত হয়। তীর্থঙ্করগণ এরূপ জীবন্মুক্ত অবস্থাপ্রাপ্ত, কেবল-জ্ঞান সম্পন্ন, সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী।

সম্যক্ চারিত্র

সংযম, ত্যাগ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ও শুদ্ধ আচরণকে চারিত্র বলে। সম্যক্ দর্শন ও সম্যক্ জ্ঞান উৎপন্ন হইবার পর সংযমাদি চারিত্রকে **সম্যক্ চারিত্র** বলে। সাধুগণের পাঁচ প্রকার মহাব্রত, দশ প্রকার যতিধর্ম, সপ্তদশ প্রকার সংযম, শ্রাবকগণের দ্বাদশ প্রকার ব্রত এই সমস্ত সম্যক্ চারিত্রের অন্তর্গত। চারিত্র দুই প্রকারঃ—সর্বত্যাগ ও দেশ অর্থাৎ অংশত্যাগ। সাধুগণের জন্য সর্বত্যাগ ও গৃহস্থগণের জন্য অংশত্যাগ নির্দিষ্ট।

হিংসা, অসত্য, চৌর্য, অব্রহ্মচর্য ও পরিগ্রহ এই পাঁচ প্রকার আস্রব ত্যাগ; শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি আসক্ত না হওয়া; ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ এই চারিপ্রকার কষায়কে দমন করা; এবং মন, বচন ও কায়ার অশুভ প্রবৃত্তিকে দমন করা এই তিন প্রকার সংযম; ইহাই সপ্তদশ প্রকার চারিত্র। সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চারিত্রকে পূর্ণ রূপে আরাধনা করিলে মুক্তি পাওয়া যায়।

সম্যক্ দর্শন, জ্ঞান ও চারিত্র পরস্পরসাপেক্ষ, অর্থাৎ দর্শন শুদ্ধ না হইলে জ্ঞান শুদ্ধ হইতে পারে না, আবার দর্শন ও জ্ঞান শুদ্ধ না হইলে চারিত্র বা আচরণ শুদ্ধ হয় না। এই তিনটির কোন একটি বা দুইটি থাকিলেও মুক্তি হইতে পারে না। কেবল মাত্র পরিপূর্ণ শুদ্ধ দর্শন ও জ্ঞানের দ্বারাও আচরণের পরিপূর্ণ শুদ্ধতা না থাকিলে মুক্তি হয় না। অতএব সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্

চারিত্রের পরিপূর্ণ বিকাশের দ্বারাই মুক্তি হইতে পারে। শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের প্রলোভনের জন্য শুদ্ধ চারিত্র প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত দুরূহ, এ'নিমিত্ত জৈন শাস্ত্রে আচরণের বিশুদ্ধতার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ রূপ পঞ্চ মহাব্রতকে পরিপূর্ণরূপে অনুসরণ ও পালন না করিলে বিশুদ্ধ চারিত্র সম্পন্ন হওয়া যায় না। জৈন শাস্ত্রে সাধুত্বের যে আদর্শ আছে সেই আদর্শে পূর্ণ চারিত্রের বিকাশ এবং অহিংসাই চারিত্রের মূল ভিত্তি।

অহিংসা

অহিংসাকে অবলম্বন করিয়াই সাধুগণের সমস্ত নিয়ম প্রণয়ন করা হইয়াছে। কিন্তু সত্য, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ পালন না করিলে পূর্ণরূপে অহিংসা পালন করা সম্ভব হয় না বলিয়া, সাধুগণের জন্য পূর্বে উল্লিখিত অহিংসা, সত্য প্রভৃতি পাঁচটি মহাব্রত নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। আবার মন ও ইন্দ্রিয় সমূহের সংযম না করিলেও অহিংসা পালন করা যায় না ও তপস্যার অভাবে সংযম পালন করা সুকঠিন। এই সমস্ত কারণে জৈন শাস্ত্রে অহিংসা, সংযম ও তপস্যাকে ধর্ম বলে। সাধুগণকে প্রতি-ক্ষণে, প্রতি আচরণে সজাগ থাকিতে হয়,—যাহাতে কোন প্রকার হিংসা না হয়, যেন তাঁহাদের কোনও আচরণের দ্বারা অতি ক্ষুদ্র প্রাণীরও হিংসা না হয়। পাঁচটি মহা-ব্রতকে পরিপূর্ণরূপে পালন না করিলে এরূপ হিংসা হইতে নিবৃত্ত হওয়া যায় না। কঠিন উৎপীড়ন এমন কি মরণান্তিক কষ্ট উপস্থিত হইলেও সাধুগণ অম্লান বদনে, এবং নির্ভীক ও নির্বিকার চিত্তে সহ্য করেন, আততায়ীর প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও দ্বেষ বা ক্রোধ পোষণ করেন না। এরূপ

দৃষ্টান্তও বিরল নয় যে জৈন সাধু একটি সামান্য পক্ষীর জীবন রক্ষার জন্য স্বয়ং অমানুষিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়া জীবন বিসর্জন করিয়াছেন।

শ্রাবক বা গৃহস্থগণের ব্রতের কথাও পরে লিখিত হইবে। তাহাদের জন্য নিয়ম সমূহ এমনভাবে প্রণয়ন করা হইয়াছে যাহাতে তাহারা সৎপথে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে সক্ষম হইয়া তৃষ্ণাকে সংযত করিতে অভ্যস্ত হয়। তাহারা যাহাতে ধনোপার্জন করিবার, ধন-সম্পত্তি সঞ্চয় করিবার, নিজকে ও পরিবারকে বা দেশকে আততায়ীর উৎপীড়ক হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে অস্ত্রধারণ করিবার, সুযোগ পাইয়াও সকল বিষয়ে সংযত হয় এবং উচ্ছৃঙ্খল বা অসংযত ব্যবহারের দ্বারা নিজের, সমাজের, দেশের বা বৃহত্তর মানব সমাজের অকল্যাণ করিতে না পারে এবং ক্রম-বর্ধমান সংযমের দ্বারা পরিগ্রহ ত্যাগ করিতে করিতে সাধুত্বের আদর্শের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে পারে এরূপ ভাবে তাহাদের ব্রত নিয়ম প্রণয়ন করা হইয়াছে। গৃহস্থগণের পালনীয় ব্রতগুলি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে ধন-সম্পত্তি ও ভোগোপভোগের সামগ্রীর উচ্চতম সীমা নির্দিষ্ট হওয়ায়, ক্রমাগত একস্থানে ধন-সম্পত্তি বহু পরিমাণে একত্রিত হইতে পারে না; কারণ স্থিরীকৃত সীমার অতিরিক্ত উপার্জন হইলেই আরও সঞ্চয় করিতে অক্ষম হইয়া অন্ততঃ সেই অতিরিক্ত অর্থাদি ব্যয় করিতেই হইবে, এবং ব্রতধারী গৃহস্থগণের ন্যায় সংযত ব্যক্তির দ্বারা এরূপ ব্যয় সমাজের কল্যাণের জন্যই হইবার সম্ভাবনা। সঞ্চয়ের উচ্চতম সীমা স্থিরীকৃত হওয়ায় অত্যধিক লোভজনিত অন্যায় উপায়ের দ্বারা ধনাগম করিবার লিপ্সাও থাকিতে পারে না। এইরূপে তৃষ্ণা সংযত

হইলে, একস্থানে প্রভূত ধন সঞ্চিত হইয়া সমাজে ঘোর অসামঞ্জস্য ও বিপর্যয় আনয়ন করার সম্ভাবনাও বন্ধ হইয়া যায়। অনুরূপ নিয়ম ব্যক্তি হইতে সমষ্টি বা রাষ্ট্রে প্রয়োগ করিলে পৃথিবীব্যাপী সর্বপ্রকার অকল্যাণ, হত্যা ও ধ্বংসাদি নিবারিত হইতে পারে।

একটি উদাহরণের দ্বারা বিষয়টি পরিস্ফুট করা যাইতেছে। আদর্শ শ্রাবক গৃহপতি আনন্দের বিবরণে অবগত হওয়া যায় যে তাঁহার চারিকোটি স্বর্ণমুদ্রা ভূমিতে প্রোথিত ছিল, চারিকোটি স্বর্ণমুদ্রা নানাপ্রকার ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিল, চারি কোটি স্বর্ণমুদ্রা পরিমাণ সম্পত্তি ছিল। এই সমস্ত সম্পত্তির মধ্যে ৫০০ লাঙ্গল, প্রত্যেক লাঙ্গলের জন্য এক শত নিবর্তন পরিমাণ চাষাবাদের জমি ধরিয়া মোট পঞ্চাশ হাজার নিবর্তন জমি, এক হাজার গরুর গাড়ী, আটটি বৃহৎ নৌকা ইত্যাদি ছিল। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক ব্রজে দশ সহস্র গবাদি পশু করিয়া চারিটি গো-ব্রজ ছিল। ইনি যখন ভগবান মহাবীরের নিকট ব্রত গ্রহণ করেন, তখন এই সমস্ত বিস্তীর্ণ সম্পত্তির পরিমাণের বিবরণ দিয়া, এই সমস্ত সম্পত্তির অতিরিক্ত মুদ্রা, জমি, শকট, নৌকা, গো-ব্রজ প্রভৃতি সঞ্চয় না করিবার প্রতিজ্ঞা করেন। স্বয়ং মহাবীর আনন্দ গৃহপতিকে সতর্ক করিয়া দেন যে, সমস্ত সম্পত্তির উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্ত সঞ্চয় যেন না হয়। আনন্দ যথাযথ রূপে ব্রত পালন করিতেন। এখন প্রশ্ন হয় যে এই প্রভূত সম্পত্তি ও ব্যবসায় হইতে যে ধনাগম হইত তাহা তিনি কি করিতেন? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হইতে পারে যে, তাহা সৎকার্যে ব্যয়িত হইত; কেন না আনন্দের ন্যায় ব্রত-ধারী, সংযত ও আদর্শ শ্রাবকের পক্ষে অসদ্ব্যয় করা সম্ভব ছিল না। ব্রত গ্রহণের পূর্বে তিনি যে বিশাল সম্পত্তি সঞ্চিত

করিয়াছিলেন ব্রত গ্রহণের পরে, সঞ্চয়ের উচ্চতম সীমা স্থিরীকৃত হওয়ায়, তাহার আর অধিকতর বৃদ্ধি স্থগিত হইল এবং উপজাত লভ্যাংশ জন-কল্যাণের জন্য ব্যয়িত হইতে লাগিল। এইরূপে আনন্দ শ্রাবকের সদসৎ উপায়ের দ্বারা ধনোপার্জনের তৃষ্ণা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায়, অসৎ উপায় পরিত্যক্ত হইল, একস্থানে আরও অধিক ধন সঞ্চয়ের সম্ভাবনা লুপ্ত হইল, এবং অতিরিক্ত অর্থ জন-কল্যাণের নিমিত্ত ব্যয়িত হইবার পথ প্রশস্ত হইল।

দেশরক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করিবার উদাহরণও অনেক পাওয়া যায়। মগধের অধিপতি অজাতশত্রু বৈশালী আক্রমণ করিলে, বৈশালী গণতন্ত্রের অধিনায়ক মহারাজ চেটক অন্যান্য গণরাজগণ সহ দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ইনি জৈন শ্রাবক ছিলেন। দশদিন ধরিয়া ভীষণ যুদ্ধে ইনি অজাতশত্রুর কাল, সুকাল প্রভৃতি দশ-জন ভ্রাতাকে নিহত করিয়া স্বয়ং নিহত হন। এই যুদ্ধে বরুণ নামক নাগপৌত্রের বিবরণ পাওয়া যায়। ইনি ব্রত-ধারী শ্রাবক ছিলেন এবং প্রথমে প্রহৃত না হইলে অন্যকে প্রহার করিতেন না। রাজা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বরুণ দেশ রক্ষার জন্য সংগ্রামে আগমন করিতে বাধ্য হইলেন। শত্রুপক্ষের রথী সম্মুখে আসিলে ইনি তাহাকে প্রথমে প্রহার করিতে আহ্বান করেন ও নিজে আহত হইয়া পরে আততায়ীকে নিহত করেন। নাগপৌত্র আঘাতের ফলে ক্রমশঃ দুর্বল হইতে থাকিলে মৃত্যু আসন্ন জানিয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে বাহিরে আগমন করেন ও অস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া পূর্বকৃত পাপ সমূহের জন্য পশ্চাত্তাপ করিয়া ধর্মধ্যান করিতে করিতে প্রাণত্যাগ পূর্বক স্বর্গলোকে দেবরূপে জন্মলাভ করেন। বলা বাহুল্য যে সংগ্রামে নিহত হইলেই স্বর্গপ্রাপ্ত হয় এরূপ বিধি জৈন শাস্ত্রে

স্বীকৃত হয় নাই; বরং যুদ্ধে মৃত ব্যক্তিকে স্ব স্ব মানসিক পরিণাম অনুসারে নরকাদি গতিতে উৎপন্ন হইতে হয় ইহাই বিহিত আছে। নিরপরাধীকে হত্যা না করিবার ব্রত গ্রহণ করিলে অকারণে অন্যকে আক্রমণ করিবার অভীপ্সা নিয়ন্ত্রিত হইয়া যায় এবং তজ্জন্য যুদ্ধাদির সম্ভাবনা কমিয়া পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সৃষ্টির অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব

জৈনধর্ম বিশ্ব-সৃষ্টিকে অনাদি বলিয়া স্বীকার করে। এমন কোন সময়ের কল্পনা ইহাতে নাই যখন বিশ্ব কোন এক সত্তা হইতে প্রথম উদ্ভব হইয়াছিল বা যখন এই বিশ্ব কোন এক সত্তায় আবার বিলীন হইয়া যাইবে। এই মতে বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থে সব সময়ে পরিবর্তন হইতেছে কিন্তু তাহার সর্বথা বিনাশ কখনও হয় না। জীব ও অজীব অর্থাৎ চেতন ও জড় এই দুই প্রকার পদার্থের নানা পরিণামের জন্যই বিশ্বের সমস্ত দ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে কিন্তু মূল দ্রব্য সব সময়েই থাকিয়া যাইতেছে—তাহার আত্যন্তিক বিনাশ কখনও হয় না।

উৎপত্তি ও গতি

সমস্ত শরীর-ধারী প্রাণী, চেতন ও জড় এই দুই দ্রব্যের মিলনে নির্মিত ও যতদিন চেতনের সহিত জড়ের সর্বথা বিচ্ছেদ না হইবে ততদিন প্রাণীকে সংসারে পরি-ভ্রমণ করিতেই হইবে। যে উপায়ে চেতন ও জড়ের বিচ্ছেদ হইয়া চেতন সম্পূর্ণ মুক্ত হয়, সেই উপায়ের বর্ণনাই জৈন ধর্মের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। অহিংসা, সংযম ও তপস্যাই

সেই উপায়, যাহা অনুসরণ করিয়া প্রত্যেক মনুষ্য মুক্তি সাধনায় অগ্রসর হইতে পারে।

নিরীশ্বরত্ব ও মানবত্ব

সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের কল্পনা জৈনধর্মে না থাকায় অবতার-বাদের বা ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষবাদের অবকাশ ইহাতে নাই। যে সমস্ত মহাপুরুষগণ পূর্বে মুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা আমাদেরই ন্যায় মানুষ ছিলেন। জন্ম জন্মের সাধনায় তাঁহারা আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং যে কোন মানুষ এই সাধনার দ্বারা তদ্রূপ আত্মিক বিকাশ করিতে সমর্থ। মনুষ্য-জন্মই এমন একমাত্র অবস্থা যাহাতে পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক বিকাশ হইতে পারে—দেবগণেরও এরূপ আত্মিক বিকাশের শক্তি নাই।

পরিশিষ্ট ক

মহাব্রত ও অণুব্রত

ভগবান্ মহাবীর সাধু ও গৃহস্থগণের পালনের জন্য যে নিয়ম প্রণয়ন করেন তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

সাধু ও সাধ্বী

যাঁহারা গৃহত্যাগ করিয়া ভিক্ষু জীবন অতিবাহিত করেন তাঁহাদিগকে **সাধু** এবং এরূপ ভিক্ষুণীকে **সাধ্বী** বলা হয়। সাধুগণ **অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ** এই পঞ্চ মহাব্রতকে মন, বচন ও কায়ার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে যাবজ্জীবন প্রতিপালন করেন, এবং সমস্ত প্রাণীর উপর দয়া ও সমভাব পোষণ করেন। কোন প্রাণীকে হত্যা করা, বা তাহাকে কোনও প্রকার কষ্ট দেওয়া বা বলপূর্বক কোন কার্য করিতে বাধ্য করা, প্রভৃতিকে হিংসা বলে। হিংসা হইতে বিরত হওয়াকে অহিংসা বলা হয়। সাধুগণ মন বচন ও শরীরের দ্বারা স্বয়ং কোনও প্রকার হিংসা আচরণ করেন না, বা অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা হিংসা আচরণ করান না, অথবা কোন ব্যক্তি হিংসা আচরণ করিলে তাহাকে অনুমোদন করেন না। ইহা প্রথম মহাব্রত, ইহাকে অহিংসা বা **প্রাণাতিপাত বিরমণ** ব্রত বলা হয়।

সম্পূর্ণরূপে অসত্য ভাষণ পরিত্যাগ করা দ্বিতীয় মহাব্রত। ইহাকে **সত্য** বা **মৃষাবাদ বিরমণ** ব্রত বলে। সাধুগণ সর্বদা সত্য বচন বলেন। যাহাতে প্রাণী হিংসা হইতে পারে এরূপ সত্য ভাষণ করাও তাঁহাদের পক্ষে উচিত নহে,—সে স্থলে মৌনাবলম্বন করা উচিত। ক্রোধ, লোভ,

ভয় বা হাস্যের বশীভূত হইলে মিথ্যা ভাষণ হইতে পারে, অতএব সাধুগণকে ক্রোধাদি পরিত্যাগ করিতে হয়। সাধুগণ মন, বচন ও কায়ার দ্বারা স্বয়ং অসত্যাচরণ করেন না, অন্য ব্যক্তির দ্বারা করান না, বা কেহ তদ্রূপ অসত্যাচরণ করিলে তাহা অনুমোদন করেন না।

তৃতীয় মহাব্রত অচৌর্য। ইহাকে **অদত্তাদান বিরমণ** ব্রত বলে। সাধুগণ সর্বপ্রকার চৌর্য পরিত্যাগ করেন। গ্রাম, নগর, এমন কি অরণ্যাদিতেও কোনও বস্তু তাহার অধিকারী কর্তৃক প্রদত্ত না হইলে স্বয়ং গ্রহণ করেন না, কাহারও দ্বারা গ্রহণ করান না বা অন্য কর্তৃক তদ্রূপ ভাবে গৃহীত হইলে তাহা অনুমোদন করেন না। ভিক্ষা গ্রহণ করিবার সময় পরিমিত মাত্রায় আবশ্যকের অতিরিক্ত না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, ভিক্ষা গ্রহণ করেন। অতিরিক্ত গ্রহণ করিলে চৌর্যাপরাধে অপরাধী হইতে হয়।

চতুর্থ মহাব্রত ব্রহ্মচর্য। ইহাকে **মৈথুন বিরমণ** ব্রত বলে। সাধুগণ মন, বচন ও শরীরের দ্বারা সর্বপ্রকার মৈথুন সেবন পরিত্যাগ করেন। স্বয়ং মৈথুন সেবন করেন না, অন্যের দ্বারা করান না; বা অন্য কেহ মৈথুন ক্রিয়া করিলে তাহা অনুমোদন করেন না। গৃহস্থাশ্রমে মৈথুন সেবন করিয়া থাকিলে সাধুজীবনে তাহার চিন্তাও করেন না, কোনও স্ত্রীলোকের পরিত্যক্ত আসন বা শয্যায় উপবেশন, শয়নাদি করেন না, অতিরিক্ত মাত্রায় সরস কিংবা কামোত্তেজক আহার গ্রহণ করেন না, ইত্যাদি কঠোর নিয়ম পালন পূর্বক সাধুগণ চতুর্থ মহাব্রত পালন করিয়া থাকেন।

পঞ্চম মহাব্রত অপরিগ্রহ। ইহাকে **পরিগ্রহ বিরমণ** ব্রত বলে। সাধু ধন, ধান্য, ক্ষেত্রাদি ভূসম্পত্তি, গৃহ প্রভৃতি সমস্ত প্রকার পরিগ্রহ পরিত্যাগ করেন। স্বয়ং পরিগ্রহ

রাখেন না অন্যের দ্বারা রাখান না বা অন্য কেহ রাখিলে তাহা অনুমোদন করেন না। শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের বিষয়ীভূত সমস্ত প্রকার বস্তুর প্রতি মন, বচন ও কায়ার দ্বারা আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চম মহাব্রত পালন করেন।

জৈন সাধুগণ ক্ষমা, মার্দব (নম্রতা), আর্জব (সরলতা), নির্লোভতা, অকিঞ্চনতা, সত্য, সংযম, তপস্যা, শৌচ ও ব্রহ্মচর্য এই দশ প্রকার যতিধর্ম পালন করেন। তাঁহারা শত্রু, মিত্র প্রভৃতি সকলের প্রতি সমভাব অবলম্বন করেন, রাত্রিতে কোন প্রকার আহার করেন না, কোনও প্রকার যানে আরোহণ করেন না, ভিক্ষার দ্বারা জীবন ধারণ করেন, টাকা পয়সা প্রভৃতি কোন প্রকার অর্থ গ্রহণ করেন না, কোনও বস্তু সংগ্রহ বা সঞ্চয় করেন না ইত্যাদি নানা প্রকার কঠোর নিয়ম পালন করেন। সাধ্বীগণও সাধুগণের ন্যায়ই ব্রতাদি পালন করিয়া থাকেন। এরূপ নিস্পৃহ, ত্যাগী ও সংযত সাধু সাধ্বীগণ গুরুপদ বাচ্য।

শ্রাবক ও শ্রাবিকা

জৈন ধর্মাবলম্বী গৃহস্থ পুরুষগণকে **শ্রাবক** ও স্ত্রীগণকে **শ্রাবিকা** বলে। ইঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন না, কিন্তু গৃহে থাকিয়া গৃহস্থধর্ম অবলম্বন পূর্বক সৎপথে জীবিকা অর্জন করেন। শ্রাবকগণের গম্ভীর, সৌম্য প্রকৃতি, অক্রূর, অশঠ, দয়ালু, মধ্যস্থ, গুণানুরাগী, বিনীত, কৃতজ্ঞ, পরহিতকারী প্রভৃতি সদ্‌গুণ সম্পন্ন হওয়া উচিত। ইঁহাদিগের জন্য দ্বাদশ প্রকার ব্রত নির্দিষ্টঃ

১। **স্থূল প্রাণাতিপাত বিরমণ** ব্রত অর্থাৎ সংকল্প করিয়া নিরপরাধ ত্রস জীবকে হত্যা না করা।

২। **স্থূল মৃষাবাদ বিরমণ** ব্রত অর্থাৎ এরূপ মিথ্যা কথা না বলা যাহাতে অন্য প্রাণীর অনিষ্ট হয়। গচ্ছিত ধন অস্বীকার করা, ন্যায়ালয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, এক জনের সম্পত্তিকে নিজের বা অন্যজনের বলিয়া ব্যক্ত করা, বর বা কন্যার দোষ গোপন করিয়া মিথ্যা গুণকীর্তন করা প্রভৃতি ঘোর মিথ্যা কথন হইতে নিবৃত্ত হওয়া এই ব্রতের অন্তর্ভুক্ত।

৩। **স্থূল অদত্তাদান বিরমণ** ব্রত অর্থাৎ সাধারণতঃ চৌর্য পরিত্যাগ করা। যে চৌর্যে সমাজে নিন্দিত বা রাজ-দ্বারে দণ্ডিত হইতে হয় এরূপ চুরি হইতে নিবৃত্ত হওয়া। যেমন কাহারও যত্নে রক্ষিত বস্তু চুরি করা, দেয় রাজকর না দেওয়া প্রভৃতি।

৪। **স্থূল মৈথুন বিরমণ** ব্রত অর্থাৎ একমাত্র বিবাহিতা স্ত্রী ব্যতীত অন্য সর্বস্থানে মৈথুন পরিত্যাগ করা। বিবাহিতা স্ত্রীর সহিতও সংযতভাবে সম্ভোগ করা।

৫। **পরিগ্রহ পরিমাণ ব্রত** অর্থাৎ ধন, ধান্য, পশু ও অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তির একটি সীমা নির্ধারণ করা এবং ঐ নিয়মিত সীমার মধ্যে নিজের সম্পত্তি ও ভোগোপ-যোগী অন্যান্য বস্তুকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা। সীমার অতিরিক্ত ধনাদি সংগ্রহ না করা।

৬। **দিক্ পরিমাণ ব্রত** অর্থাৎ বাণিজ্য ব্যাপারে বা অন্য কোনও কারণে পূর্ব পশ্চিমাদি দিকে গমন করিবার সীমা নির্ধারণ করা।

৭। **ভোগোপভোগ পরিমাণ ব্রত** অর্থাৎ ভোগ ও উপভোগের উপযুক্ত আহার্য, বস্ত্র, গৃহ প্রভৃতি দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বস্তুর সীমা নির্ধারণ করা। যে সমস্ত দ্রব্য একবার মাত্র ভোগে আসে তাহাকে ভোগ্য, যথা আহারের

জিনিস এবং যাহা বারংবার ব্যবহারে আসে, যেমন বস্ত্র, গৃহ, আসবাবপত্রাদি, তাহাকে উপভোগ্য বস্তু বলা হয়।

৮। **অনর্থ দণ্ড বিরমণ ব্রত।** নিজের কিংবা স্বপরি-বারের প্রয়োজন ব্যতীত অনর্থক যে সমস্ত পাপাচরণ করা হয় তাহাকে অনর্থ দণ্ড বলে। এই প্রকার অনর্থ দণ্ড হইতে বিরত হওয়াকে **অনর্থদণ্ড বিরমণ ব্রত** বলা হয়। যথাঃ—শস্ত্র, গরল প্রভৃতি অন্য লোককে দেওয়া, পশু, পক্ষী আদিকে পরস্পর লড়ান, পাপকার্য করিবার জন্য উপদেশ করা, দুর্ধ্যান বা দুশ্চিন্তা করা, নীতিবিগর্হিত কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া প্রভৃতি অপ্রয়ো-জনীয় বহু কুকৃত্য হইতে বিরত হওয়া এই ব্রতের লক্ষ্য।

৯। **সামায়িক ব্রত।** দুই ঘটিকা কাল বা আটচল্লিশ মিনিট পর্যন্ত শত্রু, মিত্র প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীর প্রতি সম-ভাব অবলম্বন পূর্বক মন বচন ও কায়ার সমস্ত অশুভ প্রবৃত্তিকে নিরোধ করিয়া একস্থলে স্থিরভাবে উপবেশন করতঃ পরমাত্মার বা আত্মার ধ্যান বা স্তবন, জপাদি করাকে **সামায়িক ব্রত** কহে।

১০। **দেশাবকাশিক ব্রত।** এই ব্রতে প্রতিদিনের জন্য বিশেষ বিবেচনা করিয়া পূর্ব গৃহীত দিক্ পরিমাণ ব্রতের সীমাকে আরও সঙ্কুচিত করা হয়।

১১। **পৌষধ ব্রত।** এই ব্রতে আহার পরিত্যাগ করিয়া উপবাস স্বীকার পূর্বক সমস্ত দিন (চারি প্রহর) বা সমস্ত দিন রাত্রির (অষ্ট প্রহরের) জন্য সাংসারিক সমস্ত ব্যাপার সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করিয়া সাধুর ন্যায় ধর্ম চিন্তায় অতিবাহিত করা হয়। এই ব্রত ধর্ম সাধনাকে পুষ্ট করে বলিয়া উহাকে **পৌষধ** বলা হয়।

১২। **অতিথি সংবিভাগ ব্রত।** সাধু, সাধ্বী কিংবা অন্য সুপাত্র ও দরিদ্রাদিকে আহার্য, বস্ত্রাদি দান করা এবং

তাহাদের দুঃখ কষ্ট মোচন করিবার জন্য সামর্থ্যানুযায়ী চেষ্টা করাকে **অতিথি সংবিভাগ ব্রত কহে।**

উপরোক্ত দ্বাদশ ব্রতের মধ্যে প্রথম পাঁচটিকে **অণুব্রত** অর্থাৎ সাধুগণের মহাব্রতের তুলনায় লঘুব্রত, ষষ্ঠ হইতে অষ্টম পর্যন্ত তিনটিকে তৎপূর্ববর্তী অণুব্রত সমূহের গুণের উৎকর্ষ সাধন করে বলিয়া **গুণব্রত** এবং নবম হইতে দ্বাদশ পর্যন্ত চারিটি ব্রতকে সাধুমার্গ অবলম্বনের প্রাথমিক শিক্ষা স্বরূপ বলিয়া **শিক্ষাব্রত** বলা হয়। গৃহস্থগণকে এইরূপ দ্বাদশ প্রকার ব্রত অবলম্বন করিয়া ধর্ম পালন বা জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিতে হয়।

পরিশিষ্ট খ

উপদেশ

"এই সংসারে এরূপ বহু ব্যক্তি আছে যাহারা জানে না যে তাহারা কোন্ জন্ম হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং মৃত্যুর পরই বা কোন যোনিতে উৎপন্ন হইবে। তাহাদের আত্মা জন্ম জন্মান্তরে পরিভ্রমণ করে কি না এবং তাহারা পূর্বে কি ছিল ও পরে কি হইবে তাহাও তাহারা জানে না।"

"আবার এরূপ ব্যক্তিও আছে যাহারা নিজের সহজ জ্ঞানের দ্বারা বা অন্যের উপদেশ ক্রমে জানে যে তাহারা কোথা হইতে এখানে আসিয়াছে এবং পরে কোথায় গমন করিবে। তাহারা ইহাও জানে যে আত্মা জন্ম জন্মান্তর-গামী ও স্ব স্ব কর্মানুযায়ী নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে এবং তাহাদেরও এরূপ আত্মা আছে।"

"মনুষ্যগণ বিষয়ে অর্থাৎ শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শে এবং রাগ-দ্বেষাদিতে আসক্ত হইয়া আছে। তজ্জন্য তাহাদের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তাহারা এ জীবনে সৎকার, সম্মান বা পূজা পাইবার জন্য, কিংবা প্রাপ্ত দুঃখের প্রতিকার করিবার জন্য বা জন্ম মরণ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য নানা প্রকার (অসৎ) প্রবৃত্তি আশ্রয় করে এবং ঐরূপ প্রবৃত্তির জন্য তাহারা অন্য প্রাণিগণের হিংসা করে ও তাহাদিগকে দুঃখ প্রদান করে কিন্তু এরূপ আচরণ তাহাদের (হিংসাকারীদের) অহিতকর এবং প্রকৃত জ্ঞান প্রাপ্তির পক্ষে প্রতিবন্ধক স্বরূপ।"

"বিষয়ভোগে আসক্ত ব্যক্তি মৃত্তিকা-জীবের, জল-জীবের, বায়ু-জীবের, অগ্নিজীবের, বনস্পতিজীবের ও ত্রস অর্থাৎ গতি সম্পন্ন জীবগণের হিংসা করে। এরূপ হিংসা তাহাদের পক্ষে অহিতকর ও যথার্থ জ্ঞান লাভের প্রতিবন্ধক স্বরূপ।"

"হে মানব, যাহাকে তুমি প্রহার করিবার ইচ্ছা কর, যাহাকে বলপূর্বক অধীন করিবার, যাহাকে পরিতাপ প্রদান করিবার, যাহাকে দুঃখ প্রদান করিবার, বা যাহাকে সংহার করিবার ইচ্ছা কর, সে তুমিই অর্থাৎ সে তোমার ন্যায়ই সুখ দুঃখ অনুভব করে। এইরূপ অবগত হইয়া সরল ও প্রতিবুদ্ধ মনুষ্য কাহাকেও হত্যা করিবে না বা হত্যা করাইবে না।"

"মনুষ্যের জীবনকাল অতি অল্প। জীবন যখন মৃত্যুর নিকটবর্তী হয় তখন চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের শক্তি ক্ষীণ হইয়া যায়, মন ও বুদ্ধি বিকল হইয়া যায়, তখন যে সকল আত্মীয় স্বজন তাহার সহিত বহু বর্ষ হইতে এক সঙ্গে অবস্থান করিয়া আছে তাহারাও তাহাকে তিরস্কার করিতে থাকে। বৃদ্ধাবস্থায় হাস্য, ক্রীড়া, রতি কিংবা শৃঙ্গার করিবার শক্তি থাকে না, বয়স দ্রুত গতিতে চলিয়া যায়, সে সময়ে অত্যন্ত প্রিয় আত্মীয় স্বজনগণ তাহাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারে না। যে মাতা-পিতা অল্প বয়সে তাহাকে পোষণ করিয়াছেন এবং বয়ঃ-প্রাপ্ত হইয়া যে মাতাপিতাকে সে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে তাঁহারাও তাহাকে মৃত্যু হইতে ত্রাণ করিতে পারেন না!"

"যে ব্যক্তি আত্মীয় স্বজনগণের সহিত ভোগ করিবার জন্য কঠোর প্রযত্নে ও নানাপ্রকার কুকর্ম করিয়া যে সমস্ত ভোগোপভোগের সামগ্রী একত্রিত করিয়াছে, ভোগের সময় উপস্থিত হইলে হয়ত সে রোগাক্রান্ত হইয়া যায়, অথবা

তাহার আপন জন তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, কিংবা সে নিজেই সকলকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। অথবা সেই একত্রীকৃত সম্পত্তি দায়াদগণ বণ্টন করিয়া লয়, চোরে চুরি করিয়া লয়, রাজা লুণ্ঠন করিয়া লয় বা অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যায়। এইরূপে সুখের আশায় সংগৃহীত সম্পত্তি দুঃখেরই কারণ হইয়া পড়ে!"

"হে মানব, কেহ কাহাকেও রক্ষা করিতে সমর্থ নহে, কেহ কাহাকেও মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে না। প্রত্যেকে নিজেই নিজের সুখ দুঃখের নির্মাতা ও ভোক্তা। অতএব যে পর্যন্ত তাহার জীবন মৃত্যুর অধীন হয় নাই, যে পর্যন্ত তাহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের শক্তি বা প্রজ্ঞা, স্মৃতি, মেধা প্রভৃতি অক্ষুন্ন আছে, সে পর্যন্ত বুদ্ধিমান পুরুষ সময়ের সদ্‌ব্যবহার করিয়া নিজের কল্যাণ সাধন করিয়া লইবে।" (আচারাঙ্গ সূত্র)

"হে মানব, মনন কর ও জ্ঞানপ্রাপ্ত হও। মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত দুর্লভ। যে সময় একবার চলিয়া যায় তাহা আর ফিরিয়া আসে না। বাল্যাবস্থায়, বৃদ্ধা-বস্থায় বা গর্ভাবস্থায় যে কোন সময়ে মৃত্যু সহসা আসিয়া উপস্থিত হয়। তিত্তির পক্ষীর উপর নিষ্ঠুর শ্যেন অকস্মাৎই আসিয়া পড়ে। অতএব তোমরা সকলে সত্য-জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার জন্য সময় থাকিতে প্রযত্ন কর। মনুষ্য-গণ সমস্ত জীবন কামভোগে ও স্ত্রী পুত্রাদির স্নেহে আসক্ত থাকে। মৃত্যুর পর কি সদ্‌গতির জন্য প্রচেষ্টা করা যায়? দেব, গন্ধর্ব প্রভৃতি সকলকেই আয়ু পূর্ণ হইলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রিয় সংযোগ ও সম্বন্ধ ছাড়িয়া অবশ্যই যাইতে হয় এবং নিজের কর্মের ফল প্রত্যেককে ভোগ করিতে হয়। সে সময়ে রাজবৈভব, ধনসম্পত্তি, শাস্ত্রজ্ঞান, ধর্মজ্ঞান, ব্রাহ্মণত্ব বা শ্রমণত্ব কাহাকেও স্বকৃত পাপ কর্মের

ফলভোগ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। অতএব সময় থাকিতে সত্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইবার প্রযত্ন কর, যাহার দ্বারা কর্ম ও কর্মের কারণ সমূহকে বিনষ্ট করিয়া এই সংসাররূপ দুঃখ চক্র হইতে মুক্ত হইতে পার।"

"কিন্তু কর্মনাশ করিবার মার্গ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও দুর্গম। অনেকেই সত্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইবার আশায় সন্ন্যাসী হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি স্বীকার করে, নগ্নাবস্থা অঙ্গীকার করে, এক এক মাস পরে আহার করা রূপ কঠোর তপশ্চরণ করে কিন্তু তাহারা অন্তর কামনাকে নির্মূল করিতে সমর্থ না হওয়ায় কর্মচক্র হইতে মুক্ত না হইয়া তাহাতে আরও জড়িতই হইয়া পড়ে। তাহারা মোক্ষ সম্বন্ধে যতই বড় বড় কথা বলুক না কেন, তাহাদের নিকট হইতে কি ইহলোক বা পরলোক সম্বন্ধীয় কোনও সত্যজ্ঞান পাওয়া যাইতে পারে? যে অল্প কয়েকজন মুক্তি-মার্গের সম্যক্ উপদেশ করিয়াছেন তাঁহাদের উপদিষ্ট মার্গে যত্নপূর্বক ও যোগযুক্ত হইয়া অগ্রসর হও। যাঁহারা মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য বীরত্ব সহকারে কটিবন্ধ হইয়াছেন, ক্রোধ, মান, মায়া আদিকে নিষ্পেষিত করিয়াছেন, সম্পূর্ণ-রূপে অহিংসক হইয়াছেন, সমস্ত ক্লেশকে নাশ করিয়া শান্ত-স্বরূপ হইয়াছেন এরূপ পুরুষই সত্য মার্গের উপদেষ্টা হইতে পারেন।" (সূত্র-কৃতাঙ্গ সূত্র)

"অহিংসা, সংযম ও তপশ্চরণরূপ ধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল। যাহার মন এরূপ ধর্মে সদা সংলগ্ন তাহাকে দেব-গণও নমস্কার করেন।" (দশ-বৈকালিক সূত্র)

"অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ—এই পাঁচটি মহাব্রতকে অঙ্গীকার করিয়া বুদ্ধিমান পুরুষ জিনোপদিষ্ট ধর্ম আচরণ করে।"

"জরা-মরণের প্রবল প্রবাহে ভাসমান মনুষ্যের পক্ষে

ধর্মরূপ দ্বীপই সর্বোত্তম শরণ, গতি ও আধার।"

"এরূপ ধর্মাচারণ না করিয়া যে পরলোক গমন করে সে তথায় নানাপ্রকার আধি-ব্যাধির দ্বারা পীড়িত হইয়া দুঃখ প্রাপ্ত হয়।"

"আর যে এইরূপ ধর্মাচরণ করিয়া পরলোক গমন করে সে তথায় অল্প-কর্মী ও পীড়ারহিত হইয়া সুখ প্রাপ্ত হয়।"

"যে সমস্ত দিবস রজনী অতীত হইয়াছে তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না, যাহারা ধর্মাচরণ করে তাহাদের দিন রাত্রি সফল অতিক্রান্ত হয়।"

"হে রাজন্! যখন মনোরম কাম ভোগকে পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হইবে, তখন হে নরদেব, একমাত্র ধর্মই তোমাকে ত্রাণ করিতে সমর্থ হইবে, ধর্ম ব্যতীত আর কিছুই জগতে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারে না।"

"ধর্ম (ধর্মাস্তিকায়), অধর্ম (অধর্মাস্তিকায়), আকাশ, কাল, পুদ্গল (জড়পরমাণু) ও জীব (আত্মা)—এই ছয়টি মূল দ্রব্য। যথার্থ রূপে বস্তু স্বরূপের জ্ঞাতা জিনগণ এই ছয়টিকেই বিশ্বলোক বলিয়াছেন।" (অর্থাৎ এই ছয়টি মূল দ্রব্যের দ্বারাই বিশ্বলোক রচিত।)

"ধর্মদ্রব্যের লক্ষণ গতি (সহায়কতা), অধর্ম-দ্রব্যের লক্ষণ স্থিতি (সহায়কতা); সমস্ত পদার্থের আধার স্বরূপ যে আকাশ তাহার লক্ষণ সমস্ত পদার্থকে অবকাশ (স্থান) দান করা।"

"কালের লক্ষণ পরিবর্তন সাধন করা। জীবের লক্ষণ উপযোগ (চেতনা জনিত বোধশক্তি)। জ্ঞান, দর্শন, সুখ ও দুঃখের দ্বারা জীবকে জানিতে পারা যায়।"

"জ্ঞান, দর্শন, চরিত্র, তপ, বীর্য (শক্তি) ও উপযোগ—এই সমস্ত জীবের লক্ষণ।"

"শব্দ, অন্ধকার, প্রকাশ, প্রভা, ছায়া, আতপ. বর্ণ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ—এই সমস্ত পুদ্গলের (জড় পদার্থের) লক্ষণ।"

"জীব, অজীব (জড়), বন্ধ (কর্মের দ্বারা বন্ধ), পুণ্য, পাপ, আস্রব (কর্মবন্ধের কারণ), সংবর (আস্রব নিরোধ), নির্জরা (কর্মের ক্ষয়) ও মোক্ষ—এই নয়টি তত্ত্ব।"

"জ্ঞানের দ্বারা জীবাদি পদার্থকে জানা যায়, দর্শনের দ্বারা শ্রদ্ধা করা যায়, চারিত্রের দ্বারা ভোগ-বাসনাকে নিগ্রহ করা যায় ও তপস্যার দ্বারা কর্মফল রহিত করিয়া সম্পূর্ণ শুদ্ধ হওয়া যায়।"

"জ্ঞান, দর্শন, চারিত্র ও তপস্যা—এই চারিটি অধ্যাত্ম মার্গ। এই মার্গকে অনুসরণ করিলে জীব সদ্গতি প্রাপ্ত হয়।"

(উত্তরাধ্যয়ন সূত্র)

"মহর্ষি জ্ঞাতপুত্র (মহাবীর) সমস্ত জীবের প্রতি করুণা করিয়া ও বিশ্বের সকল তত্ত্ব অবগত হইয়া যে ধর্ম-মার্গের উপদেশ করিয়াছেন তাহা অপূর্ব ও অনুপম অতএব সদ্-গুরুর আজ্ঞানুযায়ী সেই মার্গে প্রবৃত্ত হইয়া এই সংসার রূপ ভীষণ প্রবাহের অন্ত আনয়ন কর। এইরূপে বহু ব্যক্তি এই সংসার সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।"

(সূত্র-কৃতাঙ্গ সূত্র)

জৈন ধর্ম ও সংস্কৃতি ভারতের পরম গৌরবের বস্তু। আলোচ্য পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর জীবনী, তাঁহার পরবর্তী জৈনাচার্যগণের বিবরণ, এবং সর্বশেষে ভগবান মহাবীরের অমূল্যবাণী সমূহ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্তমান জৈন যুগ বা অবসর্পিণীর শেষ তীর্থঙ্কর; পার্শ্বনাথ ইঁহার পূর্ববর্তী। ভগবান ঋষভদেব প্রথম তীর্থঙ্কর। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের পঞ্চম স্কন্ধের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিষ্ণুর অন্যতম অবতার স্বরূপে ভগবান ঋষভদেবের জীবন-লীলা উপদিষ্ট হইয়াছে। জৈন দর্শনের সম্বন্ধে পরোক্ষভাবে পরিচয় তাহাতে কিছু কিছু পাওয়া যায়, তাহা ছাড়া এতবড় একটা প্রধান ধর্মমতের সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা আমাদের কিছু নাই বলিলেই চলে। সংক্ষেপে হইলেও তীর্থঙ্কর মহাবীরের জীবনী আলোচনার ভিতর দিয়া গ্রন্থকার সেই অভাব অনেকখানি পূর্ণ করিয়াছেন। গান্ধিজীর অহিংসনীতির মূলীভূত দার্শনিকতাকে উপলব্ধি করিতে হইলে জৈন ধর্ম এবং দর্শনের সম্বন্ধে আমাদের সমাজজীবনে সমধিক আগ্রহ উদ্দীপ্ত হওয়া প্রয়োজন।

—দেশ